দীনবন্ধু মিত্রের

নীল দর্পণ

সম্পাদক

খোন্দকার সিরাজুল হক

নীলকর-নিকর-করে [illegible]
ক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহা-
গের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্কতিলক
[illegible] তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার [illegible]
[illegible]
[illegible] স্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, [illegible]
মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরাজকুলে কলঙ্ক ঘটিয়াছে
তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা
অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহু
কালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপ ছিদ্র করিতে
বৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যা
চার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ, তাহা পরিহা
র কর; তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনা
য়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে
শ মুদ্রা [illegible] মুদ্রার [illegible] করিতেছ
তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা
বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভ-পরতন্ত্র হই
প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক
তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থবি
[illegible]

দীনবন্ধু মিত্র ঃ নীলদর্পণ

সম্পাদক ঃ

অধ্যাপক খোন্দকার সিরাজুল হক্

বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রাক্তন অধ্যাপক,
মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোহর ; বাংলাদেশ।

বইটি সরবরাহ করেছে
ইস্‌লামিয়া বুক ডিপো
চক বাজার—ফরিদপুর
ফোন নং— ৩২[illegible]

ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল
২৮, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭২

প্রকাশক ঃ সুনীলকুমার চক্রবর্তী
ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল,
২৮, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭২

গ্রন্থকর্তৃত্ব ঃ
প্রদীপকুমার চৌধুরী
৬/১/১৫, পি, ডব্‌লু, ডি, রোড
অশোকগড়, কলিকাতা

প্রচ্ছদ ঃ বিপুল গুহ

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৮২ (জুলাই ১৯৭৫)

সুলভ ঃ আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা

শোভন ঃ বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রক ঃ
সুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯।২, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

বাংলাদেশে একমাত্র পরিবেশক ঃ—

উত্তরবঙ্গ লাইব্রেরী

নাটোর রোড, ঘোড়ামারা,
রাজশাহী, বাংলাদেশ

॥ নিবেদন ॥

'নীল-দর্পণ বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।'—প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষের এই উক্তি যে অতিশয়োক্তি নয়, গ্রন্থপ্রকাশের 'শত বর্ষপরে'ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণ তা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন। 'নীল-আন্দোলনে'র ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি রচিত হওয়ায় শুধু সাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, সামাজিক ইতিহাসেও এ-গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

'নীল-দর্পণ' নাটকের এই ঐতিহাসিক মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখেই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থটিকে বাংলা বিভাগের পাঠ্য তালিকায় স্থান দিয়েছে। আর তাই ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ পাঠক, গবেষকদের জন্য এই গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ সটীক-সংস্করণ অতীব প্রয়োজন। অবশ্য দীর্ঘদিন যাবত 'নীলদর্পণে'র বিভিন্ন সম্পাদিত-সংস্করণ প্রচলিত আছে এবং সেগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশেরও কোন কারণ নেই। তবু গত দশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে 'নীলদর্পণ' নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে কতকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। এই গ্রন্থ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তার কিছুটা নিরসন করার চেষ্টা করেছি। তবু সময়ের স্বল্পতাহেতু কাজে কিছুটা ফাঁক থেকে গেল। এই অতৃপ্তি দূর করার জন্য ভবিষ্যৎ সংস্করণের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রাজশাহীর বিশিষ্ট পুস্তক-ব্যবসায়ী শ্রীশক্তিভূতি চৌধুরী গ্রন্থ-প্রকাশনায় সহায়তা করে আমাকে উৎকণ্ঠা-মুক্ত করেছেন। এজন্য তাঁকে জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্তী গ্রন্থ প্রকাশ করায় আমি তাঁর নিকট ঋণী।

বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
১৫ই জুলাই, ১৯৭৫।

খোন্দকার সিরাজুল হক্

গ্রন্থসূচী

প্রথম পর্যায় ঃ

জীবনী ও সাহিত্যালোচনা

দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ /১
দীনবন্ধু মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী /১
দীনবন্ধু মিত্রের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পিমানস /৭
বাংলা নাটকের আদিপর্ব ও দীনবন্ধু মিত্র /১৪
নীলদর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি /২১
সাহিত্যে বাস্তবতা ও নীলদর্পণ নাটকে গণচেতনার স্বরূপ /৩০
সাহিত্যে উদ্দেশ্যমূলকতা ও নীলদর্পণ নাটক /৩৩
ট্র্যাজেডির স্বরূপ ও নীলদর্পণ নাটক /৩৬
নীলদর্পণ নাটকের নায়ক-সমস্যা /৪২
চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব /৪৪
নাটকে সংলাপের গুরুত্ব ও নীলদর্পণ নাটকের সংলাপ বিচার /৪৬
উপসংহার ঃ দীনবন্ধু প্রতিভার স্বকীয়তা ও সীমাবদ্ধতা /৫০

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

মূলগ্রন্থ (নীলদর্পণ) /৫২

তৃতীয় পর্যায় ঃ

তথ্য নির্দেশ, /১৪৮
শব্দার্থ-টীকা /১৫৬
গ্রন্থপঞ্জি /১৬১

দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ

বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক (১৮৬০) এক সময় যথেষ্ট উত্তেজনা ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে গ্রন্থজগতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। আজ গ্রন্থটি ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী। 'নীলদর্পণে'র মতো 'সধবার একাদশী'ও (১৮৬৬) তাঁর আরেকটি স্মরণীয় গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসনরূপে স্বীকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই প্রতিভাবান নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজও রচিত হয় নি। দীনবন্ধুর মৃত্যুর চার বছর পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁর জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে দুটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবন্ধ দুটি আজো প্রধান উপজীব্যরূপে বিবেচিত। এ ছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী রচনায় যে গ্রন্থগুলো সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেগুলো হলো :

(ক) নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড (কলিকাতা ১৮৯৭) ;

(খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : দীনবন্ধু মিত্র (পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৫৫) ;

(গ) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত : দীনবন্ধু রচনাবলী : জীবন-কথা (কলিকাতা ১৯৬৭) ; ও

(ঘ) ডঃ মিহির কুমার দাশ : দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার (কলিকাতা ১৯৬৮)।

দীনবন্ধু মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম-বংশ পরিচয় ও বাল্যকাল : ১২৩৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে) নদীয়া জেলার কাঁচরাপাড়া স্টেশনের কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়।[১] গ্রামটির চারদিকেই নদী বলে এর নাম চৌবেড়িয়া। দীনবন্ধু তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যের (১৮৭১) অষ্টম সর্গে এই গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন :

"যমুনা বিমনা বড় ত্রিবেণীর তলে,
স্নেহভরে ধীরে ধীরে জাহ্নবীর বলে—

* * *

পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীন ধাম।"[২]

দীনবন্ধুর পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। তাঁর পূর্ব পুরুষের বাসস্থান চব্বিশ পরগণার বেলিনী গ্রাম হলেও তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তাঁর মাতুলালয় নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। এখানেই দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়। কালাচাঁদ মিত্রের ছয় পুত্রের মধ্যে দীনবন্ধু ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ণ। ছাত্রজীবনে তিনি পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করে দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যজীবনের কিছু তথ্য 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে পাওয়া যায়ঃ "বাল্যকালে তিনি (দীনবন্ধু মিত্র) গ্রামস্থ পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং তাহা সমাপন হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জমিদারী সেরেস্তায় অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর কিছুতেই চাকুরীতে মন টিকিল না। তিনি পিতা-ঠাকুরের কথায় অবাধ্য হইয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন বাহির সীমুলিয়ায় পিতৃব্যের বাটী আসিয়া খুড়তুতা ভাইগণের আশ্রয়ে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে তাহাকে পালাক্রমে রন্ধন কার্যও করিতে হইত।

"কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাহার ভাবী নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদক মহাত্মা লঙ্ সাহেবের[৩] অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। লঙ্ সাহেব বালক দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় ইংরাজী লিখিতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদত্ত গন্ধর্বনারায়ণ নাম পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। তখন হইতে দীনবন্ধু নামে পরিচিত হইয়াছেন"।[৪]

ছাত্রজীবনঃ সম্ভবত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ষোল বছর বয়সে দীনবন্ধু মিত্র লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করেছিলেন। এর পরেই তিনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবেশ করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এ-স্কুলেরই নাম করণ হয় হেয়ার স্কুল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু স্কুলের শেষ পরীক্ষায় জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে (প্রথম বর্ষ) ভর্তি হলেন। পর বছর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আবার জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। এবং বাংলায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ঠিক একইভাবে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র বৃত্তি লাভ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হলেন

এবং বাংলায় শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। কলেজের শিক্ষা-বর্ষ পরিবর্তনের জন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোন বৃত্তি পরীক্ষা হয় নি। তবে এবছর ১৯শে জানুয়ারী তারিখে তিনি শিক্ষকতা কর্মের পরীক্ষায় (Teachership Examination) তিরিশ টাকা বৃত্তি লাভ করে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। কিন্তু চাকুরী গ্রহণ করার ফলে কলেজের শেষ পরীক্ষা আর তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি।[৫]

চাকুরী জীবন : ডাক-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করার পূর্বে দীনবন্ধু মিত্র স্বল্পকালের জন্য কলকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর 'তমোলুক পত্রিকা' ও 'ভারত-সংস্কারক' এই তথ্য পরিবেশন করেছিল।[৬]

কলেজ ত্যাগ করে দীনবন্ধু মিত্র ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোস্ট মাস্টারের পদ গ্রহণ করলেন। এই পদে তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে দেড় বছর কাজ করেন। কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁর পদোন্নতি ঘটল এবং তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইনস্পেকটিং পোস্ট মাস্টার নিযুক্ত হলেন। পদটি ছিল তদারকি ও তত্ত্বাবধানের, তাই তাঁকে বিভাগের বিভিন্ন ডাকঘরে যাতায়াত করে অফিসের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে হতো। একাজের বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন :

"উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে 'নীলদর্পণ' প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।...

"ঢাকা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু পুনর্ব্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়া বিভাগেই তিনি অধিককাল নিযুক্ত ছিলেন ; বিশেষ কার্য্য-নির্বাহ জন্য তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হইতেন।

"ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন পরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

"দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্ব্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। পুনর্ব্বার নদীয়া বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিককাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

সেখানে একটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় সুপর নিউমররি ইনস্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্যই এ পদের কার্য্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আপিসের কার্য্য কয় বৎসর অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগমন করেন।"[৭] এ-সময়ে তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত করে। এ-সম্পর্কে 'এডুকেশন গেজেট' (২৬শে মে ১৮৭১)-এর 'সাপ্তাহিক সংবাদে' বলা হয়: "আমরা সন্তোষ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, বার্ত্তাবহ বিভাগের বিচক্ষণ কার্য্য-সচিব শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[৮]

'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্তিতে 'এডুকেশন গেজেট' সন্তোষ প্রকাশ করিলেও বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর কার্যদক্ষতার তুলনায় এ-উপাধিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ বলে মনে করেছেন। তিনি খেদ করে বলেছেন: "দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেকদিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।"[৯]

এ থেকেই বোঝা যায়, দীনবন্ধুর চাকুরী-জীবন খুব সুখকর ছিল না। তাঁর প্রতি ইংরেজ সরকারের এই অবিচারের কথা সে যুগের 'অমৃতবাজার' পত্রিকা একাধিকবার তুলে ধরেছে। কিন্তু তবু দীনবন্ধুর প্রতি অবিচার ও অসম্মানের প্রতিকার হয়নি। বরঞ্চ তাঁকে ডাকবিভাগ থেকে শেষ জীবনে রেলওয়ে বিভাগে বদলি করা হয়েছে। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার (১৩ অক্টোবর ১৮৭২) এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, দীনবন্ধু মিত্র শেষ জীবনে ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশীদিন থাকতে পারেননি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 'হাবড়া ডিভিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।'[১০]

দীনবন্ধুর প্রতি ইংরেজ সরকারের এ-ধরণের আচরণের কারণ, অত্যাচারিত ও শোষিত কৃষক সমাজের প্রতি তাঁর সুগভীর সহানুভূতি এবং ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলদর্পণ' নাটকের রচনা ও প্রকাশ। এ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট : "দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে 'নীলদর্পণ' প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

"দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে 'নীলদর্পণে'র প্রণেতা, একথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরাজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ। বিশেষ, পোষ্ট-আপিসের কার্য্যে, নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরাজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এসকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।"[১১]

পারিবারিক জীবন : দীনবন্ধু মিত্র ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়সে বাঁশবেড়িয়ার (বংশবাটী) সরকার বংশের কালিদাস সরকারের কন্যা অন্নদাসুন্দরীকে বিয়ে করেন। এই বংশবাটীর কথা তিনি তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে'র দ্বিতীয়ভাগে (প্রকাশকাল ১৮৭৬) উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্ত্রী অন্নদাসুন্দরী অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্না মহিলা ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।[১২]

দীনবন্ধু মিত্র আট সন্তানের জনক ছিলেন। সাত পুত্র—চারুচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সুশীলচন্দ্র, কিরণচন্দ্র, ললিতচন্দ্র, জ্যোতিষচন্দ্র এবং এক কন্যা তমালিনী (বসু)। পরবর্তীকালে জ্যোতিষচন্দ্র মিত্রের পুত্র দুলালচন্দ্র মিত্র 'দীনবন্ধু জীবনী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পারিবারিক জীবনে দীনবন্ধু মিত্র দুর্লভ সুখ-শান্তির অধিকারী হয়েছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর (দীনবন্ধুর) সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উল্লেখ করেছেন : "একটি দুর্ল্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্প বয়সে বিবাহ হয় নাই।

হুগলীর কিছু উত্তরে বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতি-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিনকালে মুহূর্ত্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথম হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।”[১৩]

শেষ জীবন ও মৃত্যু : দীনবন্ধু মিত্রকে শেষ জীবনে অশেষ শারীরিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। সরকারী কর্মকর্তাদের অন্তর্কলহের জন্য শেষ জীবনেও তাঁর পক্ষে স্বস্তির সঙ্গে একস্থানে চাকুরী করা সম্ভব হয়নি। অসুস্থ শরীরে শেষ জীবনেও তাঁকে বার বার বদলি হতে হয়েছে। সরকারের এই নিষ্ঠুরতার জন্যই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। তার ফলে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষ জীবনের কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছেন : “শ্রমাধিক্যে অনেকদিন হইতে দীনবন্ধু উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কি না বলা যায় না, কিন্তু ইদানীং মনে করিয়াছিলাম যে, দীনবন্ধু বুঝি রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। রোগাক্রান্ত হইয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান এবং অবিহিতাচার বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারিত লেখার আবশ্যক নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থনা করিতাম যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।”[১৪]

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বরের ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকা দীনবন্ধুর মৃত্যুর জন্য সরকারকে দায়ী করে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন··· : If he was allowed to toil quietly in the Calcutta Post Office instead of being made to travel incessantly with his bad health from one district to another, he would have perhaps lived much longer and did not leave the country to mourn for him soon ……Babu Deno Bundhu was the nations' idol and a dagger penetrated into their hearts could not have given them greater pain than the death of him whom they most adored"[১৫]

দীনবন্ধু মিত্রের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পিমানস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্রের 'জীবনী ও কবিত্ব' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দীনবন্ধু-চরিত্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

প্রথমত, তিনি দীনবন্ধুকে ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্যশিষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চর্চা শুরু করলেও পুরোপুরি গুপ্ত কবির অনুসারী ছিলেন না।

দীনবন্ধু মিত্র যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন বাংলা সাহিত্যে গুপ্ত কবির একাধিপত্য। তিনি একদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (প্রথম প্রকাশ : ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১) প্রাচীন কবিবৃন্দের জীবনী প্রকাশ করেছেন, অপরদিকে সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তিনি তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ করে ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ প্রদান করে সেকালের যে সব তরুণ লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হিন্দু কলেজের দীনবন্ধু মিত্র, হুগলী মহসীন কলেজের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ অধিকারীর অকাল মৃত্যুর জন্য বাংলা সাহিত্য তাঁর প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্যান্য সকলেই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

লক্ষণীয় যে, রঙ্গলাল বা বঙ্কিম নন, দীনবন্ধু মিত্রই ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই এ-মতের প্রবর্তক। এ-থেকে সুস্পষ্ট যে ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের চরিত্রে এমন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যা ঐ যুগের আর কোন লেখকের মধ্যে দেখা যায় নি। ডঃ সুশীলকুমার দে এই বৈশিষ্ট্যটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : 'এ-যুগের বাঙালী চিনিতে

পারে না দীনবন্ধুকে, যিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালী।”[২] কবি ঈশ্বর গুপ্তও ছিলেন তাই। তবু ব্যক্তিজীবনের অনৈক্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পিমানসে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের ‘জীবনচরিত ও কবিত্ব’ আলোচনা করতে গিয়ে গুপ্ত কবির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

“স্ত্রী বিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার (ঈশ্বর গুপ্তের) পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।...এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবি প্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিঁধিয়া গেল।

“অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাত পরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র একঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাক হস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহরার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

“কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ লইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালা বিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল।...

“ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তী পাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

“দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্ম্মিনী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।...

“যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় না। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহভক্তি থাকিলে হয়, তাহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত

তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়।"[৩]

অপর দিকে দীনবন্ধু মিত্রের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

"একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্প বয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহ সুখে সুখী ছিলেন। দম্পতি-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্‌কালে মুহূর্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।"[৪]

ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের পারিবারিক জীবনের এই তিক্ততা ও মাধুর্য তাঁদের শিল্পিমানস গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

দীনবন্ধুর শিল্পিমানসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর বস্তুচেতনা। এই বস্তুচেতনার উৎস অবশ্যই পুঁথির জগৎ কিংবা চিন্তার জগৎ নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তিনি বাংলার মাটির মানুষকে অত্যন্ত কাছে থেকে চর্মচক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে কল্পনার মানুষ কিংবা সীমাবদ্ধ পরিধির নাগরিক মানুষ তাঁর সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছেন, "কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নয়, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সকলশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন।"[৫]—তা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু 'বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী।'[৬]—বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য বিচার সাপেক্ষ। বস্তুচেতনার ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের

বস্তুচেতনা খণ্ড বস্তু আশ্রিত, তাই তিনি বস্তুধর্মী খণ্ড কবিতার রচয়িতা ; অপরপক্ষে দীনবন্ধুর বস্তুচেতনা অখণ্ড জীবনপ্রবাহ ও সামগ্রিক জীবনের রস-পরিণতির ওপর নির্ভরশীল, তাই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে অখণ্ড জীবন-ভিত্তিক নাট্য রচনার ভেতর দিয়ে।

বাস্তব জীবন-চিত্র অঙ্কনে দীনবন্ধুর বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ তাঁর শিল্পী-সুলভ সহৃদয়তা এবং তীব্র সহানুভূতি। এই সহৃদয়তা ও সহানুভূতির রসে সিক্ত হয়েই তাঁর রচনার উপজীব্য বস্তুসমূহ খণ্ডতার সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পীর অন্তরের এই তীব্র হৃদয়াবেগ অনেকের মতে মধ্যযুগীয় জীবনচেতনার অন্তর্ভূক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তাঁর এই অনুভূতি মানবিকতা (humanitarianism) থেকে উৎসারিত, তাই তা অনাধুনিক নয়।

তবু কথা থেকে যায়। মধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্র নাগরিক চরিত্রগুলি তাঁর লেখনী স্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠেনি কেন ? এর একমাত্র কারণ, এ-ধরণের চরিত্রগুলি সম্পর্কে দীনবন্ধুর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অভাব। কারণ মধ্যবিত্ত সমাজ তখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে।[৭] এ-সমাজের চরিত্রগুলির কৃত্রিম জীবন-যাপন প্রণালী এবং তাদের মুখের কৃত্রিম ভাষা, তাদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে বাধাস্বরূপ। তাই বঙ্কিমের ভাষায় বলা যায়—'জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই।"[৮]

সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতি—দীনবন্ধুর শিল্পিমানসের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্যের অভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্র চরিত্রগুলি ব্যর্থ-সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়েছে।

দীনবন্ধু-চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা। দীনবন্ধুর এই মানস প্রবণতার ভিত্তিরূপে তাঁর সুখশান্তিপূর্ণ সফল পারিবারিক জীবনের কথা উল্লেখ করা যায়। কারণ ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় মানবজীবন সম্পর্কে যে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় তা তাঁর পারিবারিক জীবনের দুঃখ ও লাঞ্ছনা থেকে উৎসারিত, একথা অনস্বীকার্য। তাই উভয়ে হাস্যরসিক হলেও, উভয়ের সৃষ্ট হাস্যরস সমধর্মী নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'দীনবন্ধুর হাস্যরসের যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী'[৯]—মেনে নেওয়া যায় না।

কারণ "দীনবন্ধুর হাস্যরসে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাবল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু তাঁহার হাস্যরস শুধু সশব্দ ফেনিল, কলোচ্ছ্বাসে শেষ হইয়া যায় না, তাহার গভীরতর স্তরে জীবনের একটি সত্যোপলব্ধি, একটি ক্ষমা সুন্দর, মমতা-করুণ দৃষ্টি বিরাজ করে।"[১০] এ ধরণের হাস্যরসকে বিশুদ্ধ হাস্যরস বা Humour নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ হাস্যরস স্রষ্টাগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা উদারতা-স্নিগ্ধ, সহানুভূতি-কোমল এবং অভিজ্ঞতা-করুণ দৃষ্টি নিয়ে জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। দীনবন্ধুর শিল্প দৃষ্টিও উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ। অপরদিকে, ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ, যাকে ইংরেজীতে Satire বলে। এ ধরণের হাস্যরসে মিশ্রিত থাকে উপহাসের জ্বালা। এই জ্বালা পাঠকের মনে তীব্র প্রদাহের সৃষ্টি করে। তাই "যেখানেই তিনি (ঈশ্বর গুপ্ত) হাসি উদ্রেক করিয়াছেন সেখানে তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক কঠিন আঘাতপ্রিয়তার ফলে বিদ্রূপের শাণিত খোঁচায় কণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছে।"[১১]

প্রসঙ্গত, হাস্যরস স্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দীনবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যটি নিরূপণ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক রচনা হিসেবে যে তিনটি গ্রন্থের নাম করা হয়ে থাকে, সেগুলি দীনবন্ধুর মৃত্যুর (১৮৭৩) পরে প্রকাশিত হয়েছে—লোকরহস্য (১৮৭৪), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫, পরিবর্ধিত কমলাকান্ত ১৮৮৫) ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৮০, পুস্তকাকারে ১৮৮৪)।

দীনবন্ধুর সৃষ্ট হাস্যরস হিউমার-ধর্মী, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট হাস্যরস প্রধাণত স্যাটায়ার-ধর্মী। আর এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সমধর্মীতা লক্ষণীয়। তবে এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য এই যে, তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) সৃষ্ট হাস্যরস গ্রাম্যতামুক্ত, সুসংস্কৃত ও মার্জিত।

লেখকের গভীর জীবন বোধ ও মানববেদনা থেকে 'কমলাকান্তের' সৃষ্টি। তাই তাঁর এই গ্রন্থে হাসি ও কান্নার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। কমলাকান্তের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তীব্র প্রদাহের সৃষ্টি না করে বেদনাময় অনুভূতিতে পরিণতি লাভ করেছে। তাই কমলাকান্তের হাস্যরস মৃদু, কোমল ও প্রসন্নদীপ্ত। কিন্তু 'লোকরহস্যে'র হাস্যরস নিষ্করুণ, বিদ্রূপশাণিত ও মর্মভেদী। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত শরে বিদ্ধ করে সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলিকে নির্মূল করাই এ-ধরণের হাস্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'ও ব্যঙ্গরসাত্মক

রচনা। কিন্তু এ-গ্রন্থের অবিচ্ছিন্ন গল্পে রসধারা ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতাকে হ্রাস করে রচনাটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, হাস্যরসিক দীনবন্ধু মিত্রের মানস-প্রবণতা ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা ভিন্নধর্মী ছিল। হাস্যরসকে স্থূল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বেদনামিশ্রিত ও সহানুভূতি-সিক্ত বিশুদ্ধ হাস্যরসে (Humour) উন্নীত করাই হাস্যরসিক দীনবন্ধু মিত্রের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

দীনবন্ধুর মানস-প্রবণতা বিচারে তাঁর সাহিত্যরুচির প্রসঙ্গটি অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। খণ্ড বিচারে দীনবন্ধুর নাটকের ভাবধারা ও ভাষা স্থান বিশেষে স্থূলতা ও অশ্লীলতা দুষ্ট বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সমগ্র শিল্পী মানস ও রচনা বিশ্লেষণ করলে দীনবন্ধুর দুর্লভ নাটকীয় নির্লিপ্ততাই সুস্পষ্টরূপে লাভ করে। "তিনি যা দেখতেন, তাতেই তন্ময় হতেন—কল্পনার দ্বারা বাস্তবকে আদর্শায়িত করার—illusion of reality সৃষ্টির কোন চেষ্টা করতেন না। ফলে তাঁর লেখায় মানুষগুলির স্বভাব সুলভ স্থূলতা ও নিম্নরুচির কথা বাদ যায় নি। এই তথাকথিত রুচিহীনতা বিশেষ করে দেখা যায় অশিক্ষিত জনসমাজে, ইঙ্গ-বঙ্গ শিক্ষা ও কাল্‌চারের বুলিওয়ালা কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষের মুখে ও কাজে, উড্‌-জাতীয় দু'একজন অশিক্ষিত সাহেবের মধ্যে। এর অর্থ সুস্পষ্ট। যেখানেই শিক্ষার অভাব বা অল্পতা বা বিকৃতি সেখানেই রুচিগত অধঃপতন বা বিপর্যয়। দীনবন্ধুর চোখে দেখা জীবন্ত আদর্শগুলির মধ্যে এমনিতর স্থূল রুচির প্রকাশ ছিলো বলেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও তার অনিবার্য উপস্থিতি। তাঁর নাটক ও প্রহসনে যে সমস্ত ব্যক্তির আনাগোনা তাদের নৈতিক মান এর চেয়ে উন্নত হলে দীনবন্ধুর বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রুচিও উন্নত হতো।"[১২]

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকে সে রুচিও গুরুর।'[১৩] এটি অবশ্যই বিচারের অপেক্ষা রাখে। ঈশ্বর গুপ্ত খণ্ড চেতনার কবি, কিন্তু দীনবন্ধু পূর্ণাঙ্গ জীবনের নাট্যকার। স্বভাবতঃই উভয়ের শিল্প চেতনায় পার্থক্য থাকবে। পূর্ণাঙ্গ জীবন রূপায়ণে যে রস-চেতনার প্রয়োজন দীনবন্ধুর সাহিত্যরুচি তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। তাই "দীনবন্ধুর মত নাট্যরসিকের সমগ্র জীবন-দৃষ্টি শ্লীলও নয়, অশ্লীল নয়—নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ।"[১৪]

অপরপক্ষে ব্যক্তিজীবনের জটিলতা ও অশান্তি ঈশ্বর গুপ্তকে আংশিকভাবে 'পীড়ক' (Sadist) করে তুলেছিল বলেই তিনি মাঝে মাঝে শিল্পীর ভারসাম্য হারিয়ে উগ্র ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছিলেন। 'মেকি'র ওপর ছিল ঈশ্বর গুপ্তের আবাল্য আক্রোশ। আর এই উগ্রতা ও আক্রোশের ফলেই তাঁর কাব্য সহজেই স্থূলতা ও অশ্লীলতার শিকারে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাঁর যুগ-জীবনও অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের রুচি কবি ঈশ্বর গুপ্তের অনুসারী নয়।[১৫]

কিন্তু সাহিত্যিক দীনবন্ধু শুধু নাট্যকারই ছিলেন না, কবিও ছিলেন। আর কবি দীনবন্ধু মিত্রকে অনেকেই ঈশ্বর গুপ্তের অনুসারী বলে মনে করেন। কারণ কবিতা রচনায় তিনি গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভাষা, শব্দযোজনা ও ছন্দ নির্মাণে একই রীতি অবলম্বন করেছিলেন। "ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দীনবন্ধুকে শুধুমাত্র কবিতা লিখতেই সাহায্য করেনি তাঁকে কাব্যের ক্ষেত্রে শিষ্যত্বের আসনেও বসিয়েছিল। গুরুর রুচি ও আদর্শকে গ্রহণ করার সার্থক প্রয়াস পেয়েছিলেন কবি (দীনবন্ধু মিত্র)।"[১৬]—সমালোচকের এই মন্তব্য তাই অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বঙ্কিমের উপরিউক্ত মন্তব্যটি আংশিক সত্য বলে মনে হয়।

দীনবন্ধুর সমসাময়িককালে বাংলা সাহিত্যে আরেকজন প্রতিভাবান নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' (অক্টোবর ১৮৬০) প্রকাশের পূর্বেই মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (জানুয়ারী ১৮৫৯) ও 'পদ্মাবতী' (মে ১৮৬০) নাটকদ্বয় এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' (১৮৬০ সালের প্রথমদিকে) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০ সালের প্রথম দিকে) প্রহসনদ্বয় প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই দীনবন্ধুর নাট্যরচনায় মধুসূদনের প্রভাবের কথা মনে আসবে। ডঃ অজিতকুমার ঘোষও তাঁর গ্রন্থে এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "দীনবন্ধুর নাটকে, বিশেষত তাঁহার প্রহসনে মধুসূদনের সুস্পষ্ট প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু কাব্যধর্মী মাইকেলের নাটকে যে সৃষ্টি প্রভাতী তরুণ ছটায় আভাসময় হইয়া উঠিয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকে তাহাই সুদূর-প্রসারী প্রদীপ্ত আলোকে পরিণতি লাভ করিয়াছে।"[১৭] দীনবন্ধুর প্রহসনত্রয়—বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬) ও জামাই বারিক (১৮৭২)-এ মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়ের কিছু প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক

'নীলদর্পণ' তাঁর একক অভিজ্ঞতা ও মৌলিক প্রতিভারই ফলশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার হিসেবে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর মধ্যে সাদৃশ্যের থেকে বৈসাদৃশ্যই ছিল বেশী। মধুসূদনের নাটক রচনার পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে বিদগ্ধ শিল্পীর রস-চেতনা, অপরপক্ষে দীনবন্ধুর নাট্যরচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে বাঙালীর শাশ্বত জীবন বোধ ও সমকালের বিক্ষুব্ধ গণজীবন। তাই মধুসূদনের মানস প্রবৃত্তি মূলত রোমান্স-ধর্মী। কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টি চেতনা ছিল সম্পূর্ণরূপে বাস্তব ভিত্তিক। ফলে আংশিক কল্পনা-নির্ভরতাও তাঁর জন্য ব্যর্থতা বহন করে এনেছে। কারণ "তাঁহার দৃষ্টি, প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে পরোক্ষ আছে তাহা ভেদ করিতে চাহে নাই ; যাহা নিকট, যাহার সঙ্গে প্রাণ-মনের সম্পর্ক অব্যবহিত, যাহা বাহিরের বিকাশ-ভঙ্গিমাতেই, অতি উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেই, রস সম্পৃক্ত হইয়া উঠে—তিনি ছিলেন সেই জীবনের মুগ্ধ উপাসক।"[১৮]

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে উনিশ শতকের মানুষের চিত্তলোকে যে আলোড়ন জাগে তাতে তারা প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনের চাঞ্চল্য ও নবমূল্যবোধকে আয়ত্ত করার জন্য অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মধুসূদন ও বঙ্কিম হলেন এই পথেরই পথিক। কিন্তু দীনবন্ধু তাঁর সাহিত্য জীবনে 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন' করতে চেয়েছিলেন। তিনি হতে চেয়েছিলেন 'মাটির কাছা-কাছি'র শিল্পী। কিন্তু সরকারী চাকুরে দীনবন্ধু ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতার ফলে তিনি এপথে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তবু নাট্যকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ গণজীবনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন বলেই 'নির্যাতিত জীবনের সহানুভূতিশীল বাণীকার'—রূপে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলা নাটকের আদিপর্ব ও দীনবন্ধু মিত্র

ইউরোপীয় নাট্যশালা সম্পর্কে সচেনতার মধ্য দিয়েই বাংলা নাটকের জন্ম সম্ভব হয়েছে। পুরানো নাট্যগীত ও যাত্রার সঙ্গে আদিপর্বের কোন কোন বাংলা নাটকের কোন কোন অংশের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেলেও বাংলা নাটকের উৎপত্তির উৎস এগুলো নয়। তবে আদিপর্বে বাংলা নাটক যাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

বাংলা নাটকের আদিপর্ব বলতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকাল অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে।[১] এই কাল পরিধির মধ্যে তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকার মধুসূদন, দীনবন্ধু ও মনোমোহন বসুর সাক্ষাৎ মেলে। মনোমোহন বসুর প্রথম নাটক 'বামাভিষেক' 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের সাত বছর পরে প্রকাশিত হয়। সুতরাং দীনবন্ধুর পশ্চাদপট রচনায় মনোমোহন বসুর কোন ভূমিকা নেই। 'নীলদর্পণের' প্রকাশ কালেই[২] মধুসূদনের দুটি নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) ও 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) এবং দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর প্রকাশ ঘটেছে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রচনা (৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬০) শেষ হলেও প্রকাশ ঘটেনি। এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা বিচার্য।

'নীলদর্পণ' পর্যন্ত বাংলা নাটকের আদিপর্বে মোটামুটি চারধরণের নাটক[৩] পাওয়া যায় ঃ

(ক) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ঃ

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' (১৮৬০),'নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' (১৮৫৫) ; কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী' (১৮৫৭) ও 'মালতী মাধব' (১৮৫৯) এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' (১৮৬০)।

(খ) পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যায়ন ঃ

তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২); হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) ; কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) ; এবং মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) ও 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)।

(গ) সামাজিক বিকৃতি ও সমস্যার উপস্থাপনা ঃ

জি, সি, গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' (১৮৫২) ; রামনারায়ণ তর্করত্নের 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩) ও 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) ; উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৬) ; উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ' (১৮৫৬) ; রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা মনোরঞ্জন' (১৮৫৬) ; বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা-পরিণয়োৎসব' (১৮৫৭) ; নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির 'কলি-কৌতুক' (১৮৫৮) ; শিমুয়েল পীরবক্সের 'বিধবা বিরহ' (১৮৬০) ;'রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ' (১৮৬০) ; শ্যামাচরণ শ্রীমাণির 'বাল্যোদ্বাহ নাটক' (১৮৬০)

এবং মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)।

(ঘ) ইংরেজী নাটকের মর্মানুকরণ ঃ

হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্তবিলাস'—Merchant of Venice অবলম্বনে (১৮৫৩)।

উপরিউল্লিখিত নাটকের তালিকা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশের পূর্বে বাংলা নাটক বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে সুনির্দিষ্ট নাটকীয় আদর্শ অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য সমকালে রচিত ও প্রকাশিত মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় এ-ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম।

বাংলা নাটকের প্রাথমিক অবস্থায় সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ ও অনুসরণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সে যুগের বাঙালী নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটককে সামনে রেখেই বাংলা নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এবং সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রীতিনীতি পদে পদে তাঁরা মেনে চলেছেন। ফলে তাঁদের রচনায় দেখা দিয়েছে আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা। তাছাড়া অপরিণত বাংলা গদ্যের জন্যও তাঁদের নাটকের সংলাপ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বাংলা নাটক পাশ্চাত্ত্য নাট্যধারায় বিকাশ লাভ করায় এ-যুগের নাট্যচর্চা বাংলা নাটকের পরিপুষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি।

বাংলা নাটকের আদিপর্বে ইংরেজী নাটক, বিশেষ করে শেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। 'ভানুমতি চিত্তবিলাস', 'চারুমুখ-চিত্তহরা' বা 'সুশীলা-বীরসিংহ' শেক্সপীয়ারের অক্ষম ও দুর্বল অনুবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজী নাটকের সংস্পর্শ লাভের ফলে বাংলা নাটক অনেক সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম দুটি মুদ্রিত নাটক তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২) এবং জি, সি, গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' (১৮৫২) মূলত ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রভাব সম্ভূত। 'ভদ্রার্জ্জুনে'র আখ্যানবস্তু মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও রচনা রীতিতে ইংরেজী নাট্যাঙ্গিকের ছাপ সুস্পষ্ট। 'কীর্ত্তিবিলাস' শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের ছায়ানুসরণে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্তক নাটক। ভারতীয় সাহিত্যে মরণান্তিক নাটকের বিধি না থাকায় নাট্যকার জি, সি, গুপ্তকে কৈফিয়ত দেবার জন্য নাটকে একটি দীর্ঘ ভূমিকা

সংযোজন করতে হয়েছিল। বিয়োগান্তক নাটকের সমর্থনে তিনি উক্ত ভূমিকায় বলেছেন :

“অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি দেখাইতে পারে যে, যে-অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ সেক্সপিয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—

আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।”[৫]...

নাট্যকার জি, সি, গুপ্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে ট্র্যাজেডি রচনার অন্তবর্তী জীবনবোধ ও আঙ্গিক-চেতনার পুস্তকাশ্রয়ী জ্ঞানের পরিচয় দিলেও সৃজনী প্রতিভার অভাবে ‘কীর্তিবিলাস’ নাটক হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

নাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে তারাচরণ শীকদারও যে সচেতন ছিলেন ‘ভদ্রার্জুনে’র ‘বিজ্ঞাপন’ থেকেই তা জানা যায়। বিজ্ঞাপনের এক জায়গায় নাট্যকার বলেছেন :

“এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটকপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক-সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) এক্‌ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্‌ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্‌ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয় তাহাকেই (Scene) সিন্‌ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত।

নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইউরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইউরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের, ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"৬

নাটকের 'বিজ্ঞাপন' থেকে মনে হয় নাট্যকার ভালো নাটক রচনার পথ নির্দেশের জন্যই 'ভদ্রার্জুন' লিখেছিলেন। কিন্তু নাটকটির কাহিনী বিন্যাসে কিংবা চারিত্রিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে তিনি এই শিল্পবোধের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নি। শৈল্পিক গুণাবলীর অনুপস্থিতির কারণেই 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তি-বিলাস'—আদিপর্বের এ-দুটি নাটক সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ঐতিহাসিকতার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে নি।

'যে নাটকে দেব-মহিমাকে বা ভক্তি-মাহাত্ম্যকে শেষ পর্যন্ত বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়' ৭ তাকেই পৌরাণিক নাটক বলা যায়। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করলে দীনবন্ধু পূর্ববর্তী যুগে সত্যিকার পৌরাণিক নাটক রচিত হয়নি। 'ভদ্রার্জুন', 'কৌরববিয়োগ' ও 'সাবিত্রি-সত্যবান' মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও এগুলোকে ঠিক পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। নাট্যকার তারাচরণ শীকদার, হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ নাটকীয় কাহিনীর প্রয়োজনেই মহাভারতের মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন, ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে নয়। তুলনামূলকভাবে এই তিনটি নাটকের মধ্যে 'ভদ্রার্জুনই' অধিকতর পরিণত। 'অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণ' এই নাটকের উপজীব্য বিষয় হলেও নাট্যকার 'বাংলার স্বভাবধর্মের তুলিকায় রঞ্জিত' করে চরিত্রগুলিকে আধুনিক বাঙালী সমাজের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন।

মধুসূদনের প্রথম দুটি নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' মহাভারত ও গ্রীক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। তবু উপরিউল্লিখিত কারণেই এ-দুটোকেও পৌরাণিক নাটক নামে আখ্যায়িত করা যায় না। মধুসূদনও নিজে 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'কে ক্লাসিক রীতির নাট্য রচনা বলে অভিহিত করেছেন।৮ মধুসূদনের এ-দুটি নাটক তাই পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরসে সমৃদ্ধ নয়, বরঞ্চ সংস্কারমুক্তি, অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ ও মানবীয় আবেদনে সমুজ্জ্বল।

কিন্তু তখনও পুরোপুরিভাবে সংস্কৃতরীতি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি।

তাঁর নাটকীয় সাফল্য তখনও পরিমাণগত বিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, গুণগত স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত হয় নি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচিত হয়। এর অধিকাংশই বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ-সমস্যাকেন্দ্রিক। স্মরণীয় যে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু এই নাট্যজাতীয় রচনার অনেকগুলিই পরবর্তীকালে ব্যর্থ সৃষ্টি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সময়ের সমাজচেতনা-সমৃদ্ধ বাস্তব রসাশ্রিত রচনার মধ্যে রাজনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) এবং মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—প্রহসনত্রয়ের নাম নানা কারণে স্মরণযোগ্য।

'কুলীনকুল-সর্বস্ব' কৌলীন্য প্রথাকে ব্যঙ্গ করে লিখিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেও রামনারায়ণ তর্করত্ন মানববাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কৌলীন্য প্রথাকে পরিহার্য অনাচার বলে মনে করতেন। এ-জাতীয় সমাজচেতনা ও উদ্দেশ্য-মুখিতা সংস্কৃত নাটকে ছিল না। "বহুযুগ সঞ্চিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমকালীন বাংলাদেশের জনচিত্তে যে বিক্ষোভের তরঙ্গ উঠেছিল তার বাণীরূপ হল এ নাটকখানি—একটা যুগচেতনার পরিচয়বাহী বলে নাটকখানিকে বলা চলে আলোকস্তম্ভ; আর দ্বিতীয়ত, নাট্যকারের সুস্পষ্ট সমাজচেতনা সে যুগের বহু নাট্যকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জীবন-সচেতন নাটক রচনায়; সে হিসেবে নাটকখানি নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী।"[৯]

বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বাস্তবতার পরিচয়বাহী হলেও 'কুলীনকুলসর্বস্ব' মূলত সংস্কৃত-রীতিতে লিখিত। নান্দী-সূত্রধর-নটীর প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু হয়েছে প্রহসনটি। সমগ্র রচনাটি সংস্কৃত-রীতি অনুযায়ী ছয়টি অঙ্কে বিভক্ত। হাস্যরস সৃষ্টিতে স্থূলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ার ফলে নব্যরুচি রামনারায়ণ তর্করত্নের আয়ত্বে ছিল না। ফলে ভারতচন্দ্র-কবিওয়ালা ও ঈশ্বর গুপ্তের রুচি ও রসবোধের ধারায় তাঁর আবির্ভাব ঘটে।

অপরদিকে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটির পথ ধরেই বাংলা নাট্যসাহিত্য সংস্কৃত নাট্যজগতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশ্চাত্ত্য নাট্য পদ্ধতির প্রতি আস্থা প্রকাশ করলো। প্রচারধর্মিতাকে উপেক্ষা করে নাটকে শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা মধুসূদনই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলেন এবং তাঁরই দুর্লভ প্রতিভার সংস্পর্শে

সমাজচিত্রের স্থানে এলো ঘটনার প্রত্যক্ষতা। এ সবই সত্য। তবু বাংলা নাটকের সমৃদ্ধির জন্য দীনবন্ধুর আবির্ভাব ছিল প্রত্যাশিত। স্মরণীয় যে, মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় ও নীলদর্পণ একই বছরে (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। কিন্তু নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রায় সমসাময়িক হলেও উভয়ের শিল্প-চেতনার ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন। মধুসূদন মূলত রোমান্সধর্মী শিল্পী, কিন্তু দীনবন্ধু বাস্তব জীবনের রূপকার। মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় বাস্তব জীবন-ভিত্তিক সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে এই প্রহসনদ্বয় ও কৃত্রিমতা-দোষ এড়াতে পারে নি। প্রকৃত পক্ষে এই প্রহসন দুটির সার্থকতা-এর বাস্তব-চেতনার মধ্যেই যে, সীমাবদ্ধ নেই তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রখ্যাত সমালোচক গোপাল হালদার দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য :

"মধুসূদনের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে দীনবন্ধুর নাটকের বিশেষ যোগ নেই। সেই রোম্যান্টিক জগৎ দীনবন্ধুর পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব প্রত্যক্ষের চিত্রাঙ্কণে, বহুদর্শিতায়, বাস্তবতায় এবং হাস্যরসের সৃষ্টিতে। বাঙলা নাটকও গোড়া থেকে সমাজের জীবন্ত সমস্যাকে প্রধান বিষয় করতে চেয়েছে, তা মনে রাখা প্রয়োজন—শুধু রোম্যান্টিক প্রেরণায় তা চলে নি। দীনবন্ধু সে সমাজ-পরিচিত বাস্তব ধারায় আরও শক্তি সঞ্চার করেন। কিন্তু নাটক রচনায় পা বাড়ালেও নাট্যকলার রহস্য তিনি বিশেষ আয়ত্ত করতে পারেন নি—ভাবে ভাষায় তাঁর বাঙলা নাটকের এ ত্রুটি পরেও সহজে দূর হয় নি। বারে বারেই তাঁর নাট্যকলা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তবু নিজের বহুদর্শিতায় ও চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতায় এমন কিছু দীনবন্ধু দান করতে পেরেছেন, যা ত্রুটি সত্ত্বেও টিকেছে—যা নাট্যশালার কর্মীদের অভিনয় আগ্রহকে জীবন্ত ও দর্শকদের আগ্রহকে তৃপ্ত করেছে; এবং যা বাঙালী সাধারণের কাছে ভালো মন্দ শুদ্ধ কিছু সজীব মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে—তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, নিমচাঁদ, ঘটিরাম, নদেরচাঁদ তার দৃষ্টান্ত। আমরা আরও দেখেছি—'সধবার একাদশী'র মতো সামাজিক চিত্র না পেলে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যুবক-প্রতিষ্ঠাতারা সে পক্ষে সাহস করতেন না। নাটকের ও নাট্যশালার ইতিহাসে দীনবন্ধুর স্থান তাই অনস্বীকার্য। দীনবন্ধুই প্রথম সার্থক বাঙালী নাট্যকার।"[১০]

নীলদর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বাংলাদেশে নীলচাষ, নীলকরদের অত্যাচার, এবং অংশত নীল-আন্দোলনের দর্পণ। সিপাহী বিদ্রোহের দু'বছরের মধ্যে নীল-আন্দোলনের বিস্ফোরণ এবং তিন বছরের মধ্যে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সুতরাং শুধু সাহিত্যকর্ম হিসেবেই নয়, প্রজাপীড়ন ও নীল-আন্দোলনের ভাষ্যরূপেও এ-নাটকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

প্রাচীনকাল থেকেই রঞ্জনদ্রব্য হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নীলের ব্যবহার ছিল। সমগ্র পৃথিবীতে যে ৩০০ রকমের নীলগাছের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে চল্লিশ রকমের জন্ম ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। যে ধরণের গাছ থেকে সবচেয়ে ভাল নীল প্রস্তুত হয়ে থাকে তার ল্যাটিন নাম 'ইণ্ডিগো টিঙ্কটোরিয়া'। এ ধরণের নীলগাছ কেবলমাত্র ভারত উপমহাদেশেই জন্মে।[২]

বাংলাদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সর্বপ্রথম নীল প্রস্তুত শুরু হয় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ-বছর লুইবুন্নো (Louis Bonnaud) নামে এক ফরাসী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এসে চন্দন নগরের নিকট তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় দুটি নীলকুঠি স্থাপন করেন।

ইংরেজদের মধ্যে ক্যারেল ব্লুম (Carel Blume) নামে এক বণিক পরবর্তী এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সর্বপ্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন।[৩] নীলের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ার ফলে ক্রমশ সারা বাংলাদেশে নীলকুঠি স্থাপিত হতে থাকে। 'ঢাকার বিবরণ'[৪] ও 'ঢাকার ইতিহাস'[৫] থেকে জানা যায়, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় নীলকুঠির সংখ্যা ছিল দুই, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তা বেড়ে একত্রিশে পরিণত হয়। এ-সময় থেকেই নীলচাষ ও নীলব্যবসা যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলায় প্রসারিত হয়।

এভাবে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যেই নীল ব্যবসা বেশ জমে ওঠে। ফলে এ-ব্যবসা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস এবং নীল প্রধান রপ্তানী দ্রব্যে পরিণত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কোম্পানীর প্রশাসন কার্যে নানারূপ অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় কোম্পানী এ ব্যবসা ইউরোপীয় নীলকরদের হাতে তুলে দেয়। ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে নীলব্যবসার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। ফলে ইংরেজ নীলকরগণ বাংলার নিরীহ কৃষকসমাজকে নীলচাষে আরো বেশী আকৃষ্ট করার জন্য সবরকম উপায়

অবলম্বন করে। ফলে এ-সময় নীলচাষীদের আর্থিক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে। এ-ঘটনা থেকেই রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মনে এ-ধারণা জন্মেছিল যে, নীলচাষের সাহায্যে দেশীয় কৃষকসমাজের উন্নতি হতে পারে।[৬] কিন্তু অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এ-ধারণা ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। ইউরোপের বাজারে নীলের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে নীলকরগণ তাদের লাভের সমতা রক্ষার জন্য নীলচাষীদের মজুরী ফাঁকি দেওয়া শুরু করে। এভাবেই নীলচাষীদের ওপর নেমে আসে বিবেকবর্জিত ইংরেজ নীলকরগণের অত্যাচার ও অবিচার। নীলচাষের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের কৃষকগণ অত্যাচার ও অবিচারের সম্মুখীন হলেও ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় নি। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে বড়লাট লর্ড মিণ্টো ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপরে এক নির্দেশ জারী করে বললেন যে, "যে সব ক্ষেত্রে নীলকরদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিংবা যে সব ক্ষেত্রে নীলকররা চাষীদের জোর করে দাদন দিয়ে অথবা অন্যরকম বেআইনীভাবে নীলচাষ করতে বাধ্য করেছে তা যেন তাঁরা রিপোর্ট করেন।"[৭] কিন্তু 'নেটিভ'দের বিরুদ্ধে নীলকরদের অপরাধ 'প্রমাণ' করার আগ্রহ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় নি।

নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে নীল চাষীদের রক্ষা করার পরিবর্তে বিদেশী সরকার আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে নীলকরদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা বরাবর করেছে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম আইন (Regulation viii of 1819) অনুসারে দেশীয় জমিদারগণ পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করার অধিকারী হলে তারা নবাগত নীলকরগণকে বড় বড় পত্তনী দিলেন। দেশীয় বিত্তশালীরাও এভাবে পত্তনী গ্রহণ করে নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। এভাবে এক একটি পরগণার মধ্যে অনেকগুলি তালুকের সৃষ্টি হয়।[৮]

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠ আইনের (Regulation vi of 1823) সাহায্যে নীলকরগণ টাকা বা নীল বীজ দাদন গ্রহণকারী চাষীদের জমির ওপর একটা 'বিশেষ স্বত্ব ও অধিকার' লাভ করে। এ ছাড়া এই ষষ্ঠ আইনের মাধ্যমেই আদালতে তাদের (নীলকরদের) জন্য সুযোগ সুবিধার পরিধি আরো বিস্তৃত হয়।[৯]

তবু লোভের নিবৃত্তি কখনও ঘটে নি। ইংরেজ নীলকরগণ নীলচাষীদের

ওপর আরো আধিপত্য বিস্তারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়। আর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম আইন (Regulation v of 1830) পাশ করলেন। এ-আইনে দাদন গ্রহণকারী চাষীরা আইনত নীল চাষ করতে বাধ্য বলে ঘোষিত হলো। দাদন গ্রহণকারী কোন চাষী যদি নীল চাষে অসম্মতি জানায় তাহলে সে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।[১০] প্রকৃতপক্ষে এই কুখ্যাত পঞ্চম আইন পাশ হবার পর থেকেই নীলচাষীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এ-আইন বিধিবদ্ধ হবার দু'বছর পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে একমাত্র যশোহর জেলাতেই ১৬২ জন চাষী-নীলচাষের ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করে।[১১]

নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ সর্বপ্রথম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ১৮ই মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নীলকরদের অত্যাচারের নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়ঃ

> "…. মফঃস্বলে কোন কোন নীলকর প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ কারণ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনই সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়। প্রথম তাহাদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না, পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয়। ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুষ দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রক্ষা হয় না, প্রতি সনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হাল বকেয়া বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে, তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্বাহ করিতে পারে না।"[১২]

পরবর্তী তিন-চার দশকের মধ্যে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নীলচাষীগণ এই উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রমশঃ সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। নীলকর সাহেবেদের এই অমানুষিক অত্যাচার ও নীল-হাঙ্গামা সম্পর্কীয় তথ্যাবলীর পরিচয় সমকালীন কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘দৈনিক সংবাদ প্রভাকর’, অক্ষয়কুমার দত্তের মাসিক ‘তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা’ এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক ‘Hindoo Patriot’[১৩]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর মাসিক ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ১৭৭২ শকাব্দের (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিকের দুরবস্থা’ শিরোনামায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিকে নীলকরদের অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : “..নীলকরদিগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কেবল প্রজা পীড়ন করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করাই তাঁহারদের সঙ্কল্প। দেখ, প্রজারা আপনার অধিকারস্থ না হইলে তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে বল প্রকাশ ও স্বেচ্ছানুরূপ অত্যাচার করা সম্ভাবিত হয় না, অতএব তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কুঠীর সন্নিহিত গ্রাম সকল ইজারা লইয়া থাকেন, এবং তদ্বারা তাহারদিগকে স্বকীয় লোভ খর্পরে পাতিত করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ করেন।....

“নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে কেবল প্রজাপীড়নেরই বিবরণ লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনারা ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরল স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজা নাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহারদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহারদিগকে উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাঁহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবু অনুগ্রহ

ভাবিয়া দাদন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবানাদি উপলক্ষ্যে তাহারও কোন না অর্ধাংশ কর্তন যায়। একারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভ ভাব দূরে থাকুক, তাহারদিগকে দুশ্ছেদ্য ঋণ-জালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষত কৃষিকার্যই তাহারদের উপজীব্য, ভূমিই তাহারদের একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহারদের সমুদায় আশা ভরসা নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাধীনে এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? কিন্তু তাহারদের কি উপায়ান্তর আছে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? তাহারা অশ্রু-পূর্ণ নয়নে সভার মনের বেদনা নিবেদন করুক, বা অতীব কাতর হইয়া আর্তনাদ নিঃসারণ পুরঃসর তাঁহারদের পদানত হউক, কিছুতেই তাঁহারদের চিত্তভূমি কারুণ্য-রসে আর্দ্র হয় না,—কিছুতেই তাঁহারদের অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না।...

"...একে নীলকর সাহেব তাহারদিগকে উচিত মূল্যের অর্ধমাত্রও প্রদানে স্বীকৃত হন না, তাহাতে আবার আমলারা তাহারদের উপর ছলে বলে কৌশলে নানাপ্রকার অত্যাচার করে। ইহাতে শত শত ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে নীলকর সাহেবদের সন্নিধানে নীলের দাদন গ্রহণ করিয়া ক্রমে এ-প্রকার ঋণগ্রস্ত হইতে থাকে, যে তাহাদের পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতিও তৎ পরিশোধ সমর্থ হয় না। ক্লেশ, উৎকণ্ঠা, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, অনশন ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাহারদের নিস্তার নাই, তাহারদিগের ঋণ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে।...

"...কি প্রকারে যে তাহারদের এই অতি প্রভূত দুঃসহ দুঃখ নিরাকৃত হইবে, তাহা এক্ষণে অনুমেয়ও নহে। ভূস্বামির অত্যাচার, নীলকরের অত্যাচার, রাজকর্মচারির অত্যাচারের ও রাজার অশাসন ও অবিচার। যাহারা এই সমুদায় অনভিভবনীয় অত্যাচার ক্রমাগত সহ্য করিতেছে, তাহারদের আর কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? তাহারা ধন বিষয়ে দরিদ্র, জ্ঞান বিষয়ে দরিদ্র, ধর্ম বিষয়ে দরিদ্র এবং বল ও বীর্য বিষয়েও দরিদ্র হইয়াছে। তাহারদের এই দারুণ দুরবস্থা নিরাকরণেরই বা উপায় কি?" ১৪

সেকালের কয়েকজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকও তাঁদের গ্রন্থে নীলকরদের অত্যাচার ও নীল-আন্দোলন সম্পর্কীয় ঘটনার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এদিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২) এবং মীর মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) গ্রন্থত্রয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর গ্রন্থে 'নীলকরের সঙ্গে দাঙ্গা ও বিচারে নীলকরের খালাস' শিরোনামায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন ঃ

"যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে কারণ ধ্যানাদি বোনাতে অধিকলাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর ২ বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না। এই জন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাণান্তে কুঠীর মুখো হইতে চায় না কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি ভারি বিপত্তি। সম্বৎসর কলিকাতার কোন না কোন সৌদাগরের কুঠী হইতে টাকা কর্জ লওয়া হইয়াছে এক্ষণে যদ্যপি নীল তৈয়ার না হয় তবে কর্জ বৃদ্ধি হইবে ও পরে কুঠী উঠিয়া গেলেও যাইতে পারিবে। অপর যে সকল ইংরাজ কুঠীর কর্মকাজ দেখে তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক কিন্তু কুঠীতে শাজাদার চেলে চলে—কুঠীর কর্মের ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের এই ভয় যে পাছে তাহাদিগের আবার ইঁদুর হইতে হয়। এই কারণে নীল তৈয়ার করণার্থ তাহারা সর্বপ্রকারে, সর্বোতোভাবে সর্বসময়ে যত্নবান হয়।

·····নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল—প্রজারা ভয়ে ত্রাহি ২ করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির অনুরোধে তাহাদিগের বশ হইয়া পড়ে আর আইনের যেরূপ গতিক তাহাতে নীলকরদিগের পালাইবার পথও বিলক্ষণ আছে। লোকে বলে জমিদারের দৌরাত্ম্যে প্রজার প্রাণ গেল—এটি বড় ভুল। জমিদারেরা জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওতনে বজায় রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুন ক্ষেত। নীলকর সে রকমে

চলে না—প্রজা মরুক বা বাঁচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাষ বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত।”[১৫]

কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা’ গ্রন্থেও ‘পাদরি লং ও নীলদর্পণ’ শিরোনামায় নীল হাঙ্গামা সম্পর্কীয় বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ (প্রথম প্রকাশ ১৮৯০) গ্রন্থের ‘দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ’ থেকে ‘সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ’ এবং ‘উনচত্বারিংশ’ ও ‘একাচত্বারিংশ তরঙ্গ’ যথাক্রমে ‘অপূর্ব দৃশ্য’, ‘সূত্রপাত’, ‘দরকার’, ‘মনের কথা’, ‘বৈঠক’, ‘বিপরীত বুদ্ধি’, ‘গোলযোগ’ ও ‘রূপান্তর’ শিরোনামায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, উপদ্রুত নীলচাষীদের অভ্যুত্থান এবং তাদের ক্রোধানলে পতিত নীল-কর্মচারীদের বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু ‘হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা’ ও ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ গ্রন্থদ্বয় ‘নীলদর্পণ’ নাটকের পরে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এ-নাটকের পটভূমি নির্মাণে এ-দুটি নাটকের কোন ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা নেই।

বৃটিশ আমলে প্রচলিত জমিদারী প্রথার জন্যই বাংলার কৃষক সম্প্রদায় নীলকরদের দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত ও সর্বস্বান্ত হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষকে বাজাররূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের শিল্পপতি শাসক গোষ্ঠী উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে দুটি বিশিষ্ট নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি গ্রহণের ফলে নীলকর সাহেবদের শোষণযন্ত্র আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাতে বাগিচা-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ইংরেজগণকে এ-দেশে জমি ক্রয়ের অনুমতি দান করে। ফলে নীলকরগণ নীলচাষীদের কার্য পরিচালনার জন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অত্যাচারী ও ভূমিদাস পরিচালকদের এদেশে আমদানী করে। সরকারের এই নীতি গ্রহণের ফলে নীলকর সাহেবদের শোষণ-যন্ত্র আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য একথা সত্য যে, নীলচাষীদের আত্মরক্ষার সংগ্রামে দেশীয় জমিদারদের ভূমিকাও গৌরবজনক ছিল না। অধিকাংশ জমিদারই নীতিগতভাবে নীলকরদের সমর্থন করতেন। তাদের এই সমর্থনের পেছনে কাজ করেছিল জমিদার সমাজের শ্রেণীগত সমস্বার্থ।[১৫] প্রসঙ্গত ‘The Blue Mutiny’-র লেখক ব্লয়ার বি-ক্লিঙ-এর মন্তব্য স্মরণযোগ্য: ‘Accounts of oppression by the

planters should be viewed in relation to prevalent mufassal morality. The planters were probably no more oppressive than the Indian Zamindars, though they may have seemed so to a peasantry who were unaccustomed to their novel demands. Further more, ryot-planter relationships were not unremittingly hostile. Though exaggerated, the planters' claims that they saved many ryots from starvation in times of drought and protected them from repacious Zamindars had some foundation in fact.[১৬] ক্লিঙ্‌ সাহেবের এই মন্তব্যকে ভিত্তিহীন বলা চলে না। তাঁর উক্তির সমর্থনে তিনি বিশেষভাবে মোল্লাহাটির নীলকর জেম্‌স ফরলঙ্‌ সাহেবের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁকে হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Hindoo Patriot'-এ (১০ই অক্টোবর ১৮৬০) "White sheep in a black flock" বলে অভিহিত করেছিলেন।[১৭] জনৈক আনন্দ রায়ও সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে[১৮] জে, পি, ওয়াইজ নামে এক 'মানুষ' নীলকর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "সেদিনের কৃষককুল যে 'নীল'কে তাদের জীবনের শত্রু বলে মনে করেছিল, সেই নীল ব্যবসাদার সাদা চামড়ার সাহেব মানুষগুলো তাই আজও খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে 'অত্যাচারী ও ঘৃণ্য'। কিন্তু আমরা নিজেরাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই, যখন এই অত্যাচারী ব্যবসায়ীদের মাঝেই খুঁজে পাই সহৃদয় এক নীলকর সাহেবকে। এ-সেই নীলকর—এদেশ থেকে যাঁর বিদায়লগ্নে নীল প্রজারা আত্মীয় পরিজন—বিয়োগ শোকের মত কেঁদেছিল। ইতিহাসের এ-প্রসঙ্গে সত্যিই আমাদের অবাক হতে হয়, যখন দেখি, সে সময়কার চারিদিকের অত্যাচারিত নীলচাষীদের কান্না, ঋণে জর্জরিত চাষীদের হাহাকারের মাঝখানে অন্তত একজন নীলকর সাহেব হয়ে উঠেছেন প্রজাদের 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীজনক'। ইতিহাসের পাতায় একমাত্র সেই 'মানুষ' নীলকর সাহেবের নাম—জে, পি ওয়াইজ।"

বিদেশী নীলকর ও দেশীয় জমিদারদের অধিকাংশই যে অত্যাচারী ও শোষক ছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তেমনি তাদের মধ্যে দু-একজন যে 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী' ছিলেন সে-কথাও অনস্বীকার্য। তবে এই 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি সমস্যার গভীরে গেলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর নীলকর ও জমিদারদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত শ্রেণী উদগ্র লোভের

কবলে পড়ে 'হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে 'স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী নীলচাষীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও পশ্চাদপদ হয় নি, অপরপক্ষে দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণী এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিল যে 'স্বর্ণডিম্ব' পেতে হলে 'রাজহাঁসটি'কে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। সুতরাং বাংলার সহজ-সরল নীলচাষী প্রথমোক্ত শ্রেণীর অত্যাচার ও অবিচারের পটভূমিতে দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর কার্যকলাপে অভিভূত হয়ে পড়বে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'নীলদর্পণ' নাটকে নবীন মাধবের নেতৃত্বে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সাযুজ্য লক্ষণীয়। "বিষ্ণুচরণ একজন ছোট জোতদার ও দিগম্বর একজন ছোট মহাজন ছিলেন। তাঁরা উভয়েই কিছুকাল বিভিন্ন কুঠিতে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন, কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রেখে কোথাও সেই কাজে বেশি দিন থাকতে পারেন নি। নীলকরদের অত্যাচারের ফলে ক্রমশঃ তাঁরা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ও তাদের সংঘবদ্ধ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন।......বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর দেখলেন যে একটা লড়াইয়ে অন্তত নীলকরদের হারাতে না পারলে গ্রামে আর কারও বাস করা সম্ভব হবে না। শুধু চৌগাছাই নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও মেয়ে ও শিশুদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল। বরিশাল থেকে কয়েকজন নামকরা লাঠিয়াল নিয়ে আসা হল। কৃষকরা দলে দলে লাঠি চালনা, সড়কি চালনা ইত্যাদি শিখতে লাগল। একটি রায়তও নীল বুনল না; কিছুদিনের মধ্যেই কাঠগড়া কুঠি (চৌগাছা যার অন্তর্গত ছিল) বন্ধ হয়ে গেল।[১১] অবশ্য 'নীলদর্পণ' নাটকে নবীন মাধব ও কৃষক পরিবারের সংগ্রাম সার্থকতায় উন্নীত হতে পারে নি। বরঞ্চ নানা দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে দুটি পরিবারই সর্বনাশের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাদের অনুরূপ পরিণতি ঘটলেও প্রতিরোধের স্পৃহা যে কতটা আন্তরিক ছিল সমসাময়িক বিবরণই তার সাক্ষ্য বহন করে।

'নীলদর্পণ' নাটকের লাঞ্ছিতা ক্ষেত্রমনির প্রসঙ্গটি এসেছে নদীয়ার এক কৃষক পরিবারের সুন্দরী কন্যা হরিমনিকে হরণ করার প্রসঙ্গ থেকে। এ-সম্পর্কে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'The Indian stage' গ্রন্থে লিখেছেন : "Indeed Khetramani of the drama was none but Harimani a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the beauties of Krishnagar who was carried of to the Kulchikatta factory in charge of Archibald Hills, the Chota Saheb, where the girl was kept in his bed-room till late hours of the night and the kind magistrate of Amarnagar was no other person than Mr. W. J. Herschel, grandson of the great astronomer."[২০]

'নীলদর্পন' নাটকের প্রকাশ কাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। এ বছরেই নীলচুক্তি আইনের (১১ আইন) সাহায্য নিয়ে নীলকরগণ কৃষক সমাজকে নীলচাষ করানোর জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালায়। কিন্তু কৃষকসমাজ নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ততদিনে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। তারা দলে দলে জেলে গিয়েছে কিংবা আত্মগোপন করে থেকেছে কিন্তু নীলচাষ করতে রাজী হয় নি। কৃষকদের এই দৃঢ় সংকল্পের কারণে সরকার বাধ্য হয়েই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম আইনের দ্বারা নীল চুক্তির নিয়ম বাতিল করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলাদেশে পূর্বের তুলনায় নীলচাষের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী আভল্ক ফন্ বেইয়ার আলকাতরা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম নীল রং প্রস্তুত করেন। এই নীল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাজারে সস্তাদরে চালু হওয়াতে ভারতে নীল চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

সাহিত্যে বাস্তবতা ও নীলদর্পণ নাটকে গণচেতনার স্বরূপ

'আর্টের ঘর তো সংসারের বাইরে নয়। আর্ট বড়ো জোর স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা দাবী করতে পারে না। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়া তার দেহের বাইরের সঙ্গে তার এলাকার বাইরের সঙ্গে ওতপ্রোত।"[১]—অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই উক্তির মধ্য দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্কের সূত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্য অবশ্যই বাস্তবের যথাযথ অনুকৃতি নয়, সে জন্যই সে স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। কিন্তু বাস্তবতাকে বর্জন করে সাহিত্য কেন, কোন শিল্পেরই জন্ম সম্ভব নয়। তবু প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য পদবাচ্য বেশ কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায় যার মধ্যে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ নয়। সে সকল রচনায় আলৌকিকতার আবরণে বহু জায়গায় সমাজ-জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে

বাঙালী সাহিত্যিকগণের জীবন বোধের আমূল পরিবর্তন ঘটলেও ঐ শতাব্দীর ষোড়শ দশকের পূর্বে সাহিত্যে ভাবালুতা বর্জিত প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের সাক্ষাৎ বড় একটা মেলে না। প্রসঙ্গক্রমে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বা প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা মনে পড়বে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত খণ্ডিত। এই পটভূমিতে দীনবন্ধুর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। "বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক দিয়ে বিচার করলে দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে সে যুগের পক্ষে অগ্রগামী সাহিত্য সৃষ্টি বলে স্বীকার না করে উপায় থাকে না। সে ভাব-সর্বস্বতার যুগে যুগন্ধর সাহিত্যিকরা (যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম) যখন মুখ্যতঃ পুরাণ ও ইতিহাসের সুদূর কাহিনী অবলম্বনে রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে নিমগ্ন, তখন দরদী নাট্যকার দীনবন্ধু বাঙ্‌লাদেশের কৃষক সমাজের বেদনার শোণিত রাগরঞ্জিত কাহিনীকে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে জীবন্তরূপ দেবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। দীনবন্ধুর শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ প্রশ্নাধীন হতে পারে, কিন্তু এ দরদী স্রষ্টাকে শুধুমাত্র নাট্যকার আখ্যা না দিয়ে সমসাময়িক বাঙ্‌লাদেশের নবজাগ্রত জীবন বোধের চারণ-কবি বলাই বোধ হয় সমীচীন। গত শতাব্দীর বাস্তবধর্মী রচনার ক্ষেত্রে নীলদর্পণ পতাকীস্থানীয়। সে যুগের নিছক কল্পনা ·প্রধান রচনাদর্শের সামনে নীলদর্পণ স্থাপন করেছিল বাস্তবমুখী নাটকের এক মহৎ আদর্শ।"২

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বর্তমানে সাহিত্যিকবৃন্দ যে অর্থে 'গণ' শব্দটি ব্যবহার করেন, একশো বছর আগে বাংলাদেশে শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। শিল্পায়নেয় ব্যাপক অগ্রগতি পাশ্চাত্যদেশে যে ধনতান্ত্রিক বৈষম্য সৃষ্টি ক'রে 'বুর্জোয়া' ও 'প্রলিটারিয়েট' নাম দুটো পরস্পর বিরোধী শ্রেণী সমাজের সৃষ্টি করেছে, তা আজও বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গভাবে সৃষ্টি হয় নি। তবু বর্তমানের বাংলাসাহিত্যে শ্রেণী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে গণ-চেতনার স্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টা চলছে। প্রকৃতপক্ষে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে গণসমাজ বলতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বৃহত্তর জনসাধারণকেই বুঝায়। এই দৃষ্টি কোণ থেকেই 'নীলদর্পণ' নাটকে গণ-চেতনার স্বরূপ বিচার্য।

নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নীলকরদের অত্যাচার বাংলার বৃহত্তর জনসাধারণের মনে প্রতিরোধের এষণা জাগ্রত করেছিল। কারণ 'নীলকরদের উদগ্র অর্থলোভেই যে কৃষকদের জীবন বিপন্ন করেছিল এমন নয়। তাদের ধন লোভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল

নীতিশূন্য ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা। নীলকরদের মিথ্যা মোকদ্দমার সামনে বাঙালী কৃষক তার অসহায় অবস্থাকে সেদিন প্রত্যক্ষ করেই মুক্তি পায় নি, তাদের গৃহজীবনের পবিত্রতাকে কলুষিত হতে দেখেছে।'[৩] তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে এই অত্যাচার ও অবিচার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছে। ফলে নীল-বিদ্রোহ স্বল্পকালের মধ্যেই একটি গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। এই আন্দোলনের সুস্পষ্ট তিনটি স্তর সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

(১) গণ-দরখাস্তের মাধ্যমে আবেদন-নিবেদন ; মীর মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) গ্রন্থে যার পরিচয় বিধৃত। (২) অসহযোগিতা ; প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) গ্রন্থে যার চিত্র অঙ্কিত। (৩) কৃষক-বিদ্রোহ : কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২) গ্রন্থে যার কথা উল্লিখিত।

নীলচাষীরা প্রথমত পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও ছোটলাটের নিকট গণ-দরখাস্ত পাঠিয়ে অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করে। আর এভাবেই চাষীদের স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন অসন্তোষ ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়ে জাতীয় আকার ধারণ করতে থাকে। কিন্তু গণ-দরখাস্তে নীলকরদের অত্যাচারের কোনই প্রতিকার হলো না। তখন বাধ্য হয়েই নীলচাষীরা অসহযোগিতার পথ গ্রহণ করলো অর্থাৎ তারা আর কখনো নীল বুনবেনা বলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো। 'নীল কৃষকদের ধর্মঘট মূলত নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম। কিন্তু নীলকরদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য ও ধর্মঘট ভাঙ্‌বার জন্য সরকার যখন দলে দলে পুলিশ ও সৈন্য পাঠাতে শুরু করল, তখন থেকেই এই আন্দোলন খোলাখুলি ভাবে রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করল।"[৪]

নীলচাষীদের এই গণ-আন্দোলন সম্পর্কে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখের 'Hindoo Partriot' যে মন্তব্য করে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"Bengal might well be proud of its peasantry. In no other Country in the world is to be found in the tillers of the soil the virtues which the ryots of Bengal have so prominently displayed ever since the Indigo agitation had begun. Wanting power, wealth, political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social history of any other Country."[৫]

কিন্তু দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' নীল-আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না। এই আন্দোলনে বাংলার নীলচাষীরা যে অপূর্ব শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছিল তা তাঁর নাটকে অনুপস্থিত। কারণ 'দীনবন্ধুর রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না, সামাজিক সমস্যা বা তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু বাস্তবে যা দেখতেন তা তাঁকে নাড়া দিত—বিশেষ করে অত্যাচারিতদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের যোগ।"[৬] আর অত্যাচারিতদের প্রতি তাঁর এই গভীর সহানুভূতির জন্যই 'নীলদর্পণ' নাটকে একে একে এসেছে গোলক বসু, নবীন মাধব, সাধুচরণ, রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি ও তোরাপ। যদিও নবীনমাধব, রাইচরণ ও তোরাপের মধ্যে অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশিত হয়েছে তবু 'নীলদর্পণ' নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ অন্যত্র অবস্থিত। গোলক বসু, সাধুচরণ ও রাইচরণের দুর্ভাগ্য ও হাহাকারের করুণ চিত্র এবং লালসার যূপকাষ্ঠে উৎসর্গীকৃত অসহায় কৃষক-কন্যা ক্ষেত্রমণির আর্তনাদের 'অতিদুরূহ ও নিদারুণ দৃশ্য'[৭] অঙ্কন করে দীনবন্ধু পাঠক ও দর্শকে সহানুভূতি প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছেন। আর এখানেই 'নীলদর্পণ' নাটকের সার্থকতা। তাই এ-নাটকে গণ-আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত না হলেও নাট্যকারের গণ-চেতনার পরিচয় স্পষ্টরূপে বিধৃত।

সাহিত্যে উদ্দেশ্যমূলকতা ও নীলদর্পণ নাটক

"একজনই হোক আর বহুজনই হোক, একপক্ষ দাতা, অপর পক্ষ গ্রহীতা একপক্ষ জ্ঞাপক, অপরপক্ষ জ্ঞাতা। দুই পক্ষ নিয়ে যেমন পক্ষী, তেমনি আর্ট।"[১] অর্থাৎ শিল্প বা সাহিত্য অনন্যনির্ভর নয়। সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য সর্বদাই ক্রিয়াশীল। ডি-এইচ লরেন্স যখন বলেন 'Art for my sake' তখনও এ সত্যের অর্থান্তর ঘটে না। কারণ তাঁর 'আমি' ব্যক্তি আমি নয়, 'সামাজিক আমি'। তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্যমূলকতাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উদ্দেশ্য-সর্বস্বতা সাহিত্য নয়, প্রোপাগাণ্ডা। সাহিত্যের কতকগুলো নিজস্ব ধর্ম আছে। সেই ধর্মগুলো রক্ষিত হলে উদ্দেশ্য সাধন করেও যে-কোন রচনা সাহিত্য পদবাচ্য বলে গণ্য হতে পারে।

'নীলদর্পণে'র ভূমিকায় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বলেছেন : 'নীলকর-নিকর

করে 'নীলদর্পন' অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।"[২] এথেকে স্পষ্ট যে, দীনবন্ধু 'নিরাশ্রয়' কৃষক সমাজকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই নাটকটি লিখেছিলেন। অর্থাৎ 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার উদ্দেশ্য 'প্রজাব্রজের' মঙ্গল সাধন। এ নাটক রচনার ফলে কৃষক সমাজের কতটা মঙ্গল সাধিত হয়েছিল, তা ঐতিহাসিকের কৌতূহলের বিষয় হতে পারে, তবে একথা সত্য যে, নীল-হাঙ্গামা থেমে গেলেও 'নীলদর্পণ' নাটকের আবেদন শেষ হয়ে যায় নি। "১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গ সমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। 'নীলদর্পণ' কে লিখিল তাহা জানিতে পারা গেল না ;[৩] কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়রানী লো সই নীল গেজেছ কই' ? ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল। যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পাদ্‌রী জেম্‌স লং সাহেব তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল গ্রন্থকারকে না পাইয়া ইংলিসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া ১৮৬১ সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।"[৪]— শিবনাথ শাস্ত্রীর এই বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট যে 'নীলদর্পণ' সমসাময়িককালে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। অর্থাৎ নাটকটি সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনে সার্থকতা লাভ করেছিল। কিন্তু নীলচাষ, নীল হাঙ্গামা ও নীল-আন্দোলন আজ ইতিহাসের বস্তুতে পরিণত হলেও 'নীলদর্পণ' সাময়িকতাকে অতিক্রম করে এ-যুগেও পাঠক ও দর্শকমনে আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। তাই 'নীলদর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক নাটক হলেও উদ্দেশ্য সর্বস্বতা এর ধর্ম নয়। দীনবন্ধু জীবন ও জীবন-সত্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে নাটকের চরিত্রগুলিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সেগুলি সাময়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করে চিরন্তনতার ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।[৫]

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও অবিচারেরর রূপকে পরিস্ফুট করার

জন্যই দীনবন্ধু গোলক বসু ও সাধুচরণের পরিবারকে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নীলকরগণ সামান্য দাদনে উভয় পরিবারকে নীলচাষ করতে বাধ্য করে। দাদনে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে সাধুচরণ ও তার ভাই রাইচরণকে কুঠিতে আবদ্ধ করে তাদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি জানালে বসু পরিবারও নীলকরদের এই নির্মমতার হাত থেকে রক্ষা পায় নি।

উভয় পরিবারের প্রতি নীলকরদের এই নির্মম অত্যাচার মূলত সেযুগের একটি সামাজিক সমস্যাকেই স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু নাট্যকার এই সমস্যার মধ্যে তাঁর দৃষ্টিকে আবদ্ধ না রেখে মানবজীবনের শাশ্বত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথা-বেদনায় আলোড়িত হয়ে পরিশেষে ব্যক্তি চরিত্রের রূপ ও রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। তাই সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণি শুধু নীলকর রোগ সাহেবের লালসার অগ্নিতে দগ্ধ কিশোরী নয়; সে পুরুষের লালসার থাবায় ক্ষত বিক্ষত অসহায় নারীজাতির মূর্ত প্রতীক। '‘মুই সোনার নবিক ভেস্য়ে দিতে পারবো না মারে, মুই কনে যাবরে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মারে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মারে।'—এশুধু ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে রেবতীর ক্রন্দন নয়, সন্তানের মৃত্যুতে চিরন্তন মাতৃ-হৃদয়ের আকুল আর্তি।

তাই 'নীলদর্পণ' একটি বিশেষ যুগের সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও, যুগাতীত, চিরন্তন ও সর্বজন গ্রাহ্য উপাদানের অভাব এ-নাটকে নেই। তাই নাটকটি সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করেও সাময়িকতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত ডক্টর সুশীলকুমার দে'র মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: 'সে-যুগে সামাজিক ও রাজনীতিক অনিষ্ট সংশোধনের জন্য অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটিও নীলদর্পণের মত স্মরণীয় হইতে পারে নাই। তাহার কারণ, এই সব রচনাতে অঙ্কিত চরিত্রগুলি উদ্দেশ্যসৃষ্টি না করিয়া উদ্দেশ্যই চরিত্র-সৃষ্টি করে। ইহা সত্য, সাময়িক জীবনের কোন নিদারুণ দুঃখ দীনবন্ধুর প্রাণমন আলোড়িত করিয়া তাঁহার উন্মেষোন্মুখ প্রতিভাকে প্রেরিত করিয়াছিল; এই বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের কথা তিনি নিজেই ভূমিকাতে লিখিয়াছেন। কিন্তু যে আত্মনির্লিপ্ত বাস্তব-তন্ময়তা শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাহাই তাঁহাকে উদ্দেশ্য বিহ্বলতার দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছে।"[৫]

ট্র্যাজেডির স্বরূপ ও নীলদর্পণ নাটক

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটি বিশেষ ধরণের নাটক tragoidia থেকে ইংরেজীতে এসেছে। যার অর্থ 'ছাগলের গান'। গ্রীক 'ট্র্যাজস' (tragos) শব্দের অর্থ 'ছাগ' এবং 'অয়ডস্' (oidos) শব্দের অর্থ 'গায়ক'। অর্থাৎ যারা গান করতো তাদের বলা হতো 'ট্র্যাজয়ডস' এবং তাদের গানকে বলা হতো 'ট্র্যাজয়ডিয়া' (tragoidia)। এই শব্দটি থেকে কালক্রমে বিবর্তিত অর্থে 'ট্র্যাজেডি' (tragedy) শব্দটি এসেছে। 'ট্র্যাজেডি'র উৎস সম্পর্কে কয়েকটি মত প্রচলিত আছে ঃ

(ক) প্রকৃতি দেবতা দিউ নুসাসের মন্দিরে ছাগ বলি দিয়ে যে নৃত্যোৎসব হতো তা থেকে ;

(খ) নাটক লেখার যে প্রতিযোগিতা হতো এবং যে প্রতিযোগিতায় ছাগল উপহার দেয়ার নিয়ম ছিল তা থেকে ;

(গ) অভিনয়ের সময় যে-নাটকে অর্ধমানব ও অর্ধছাগলের রূপসজ্জা গ্রহণ করা হতো।[১]

ট্র্যাজেডির এই 'উৎস' সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। "ট্র্যাজেডির উৎস দুর্জ্ঞেয়, এবং তার সন্ধান নিষ্প্রয়োজন। দিয়নুসিয় কোনো বিশেষ ব্রত অথবা কোনো নির্দিষ্ট একটি উৎস থেকে ট্র্যাজেডি এসেছে, এ ধারণার মধ্যে সম্ভবত অসংগতি আছে। স্পষ্টই মনে হয়, প্রথমতম 'ট্র্যাজেডি' ছিল একটি নাটকীয় কোরাস-ধর্মী অনুষ্ঠান এবং তার সঙ্গে একটি মঞ্চ ব্যাপারও সংযুক্ত ছিল। কোরাসের অংশটিতে ডিথিরাম্বের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। ডিথিরাম্ব ছিল প্রকৃতি দেবতা দিয়নুসাসের সম্মানে পঞ্চাশজন নর্তকের স্তোত্রনৃত্যের অনুষ্ঠান। কিন্তু দিয়নুসাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমনও অন্যান্য সমবেত কোরস-ধর্মী অনুষ্ঠান তখন তো ছিল। অবশ্য নিজ বিবর্তনের কোনো স্তরেই ট্র্যাজেডিকে বিশেষভাবে দিয়নুসিয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে দেখা যায় নি। ট্র্যাজেডি দিয়নুসাসের উৎসবের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এই তথ্য থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, ট্র্যাজেডি সেই দেবতার পূজানুষ্ঠান থেকে সঞ্জাত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাখ্যা বরং সম্ভব।[২]

একথা অবশ্য সত্য যে, অভ্যুদয় যুগের ট্র্যাজেডি সম্পর্কীয় ধারণার সঙ্গে আজকের ধারণার খুব বেশী মিল নেই। গ্রীক 'ট্র্যাজয়ডিয়ার' আদিযুগে কাহিনীর মধ্যে দুঃখ-শোকের দৃশ্য থাকলেও বিয়োগ-ব্যথার মধ্য দিয়ে সবসময়

কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটত না।[৩] কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রীসে ঈস্‌কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ নাট্যকারদের যে সমস্ত 'ট্র্যাজয়ডিয়া' জনপ্রিয়তা লাভ করে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেগুলোতে দুঃখ ও শোক-দৃশ্যের প্রাধান্য ছিল। এরিস্টটলও এই নাটকগুলিকে সামনে রেখেই ট্র্যাজেডি-সম্পর্কীয় মতবাদ তাঁর 'সাহিত্যতত্ত্ব' (Poetics) গ্রন্থে বিবৃত করেছেন, যা পরবর্তীকালে সকল দেশের সাহিত্য-বিচারে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[৪] আর এ-থেকেই 'ট্র্যাজেডি'র অর্থ দাঁড়িয়েছে 'শোকাবহ পরিণতি সম্পন্ন নাটক'।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের সাহিত্য বিচার করলে দেখা যাবে যে, 'ট্র্যাজেডি'র সার্থকতা নির্ভর করে বর্ণিত বিষয় ও নাট্যকারের বিশিষ্ট জীবন-বোধের ওপর, কোন প্রতিষ্ঠিত সূত্র বা নিয়মের উপর নয়। যদিও প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলো বা প্রয়োগ করে কোন নাটক 'ট্র্যাজেডি' হিসাবে সার্থক কি অসার্থক, তা বিচারের প্রচেষ্টা সাধারণত করা হয়ে থাকে। আর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ট্র্যাজেডি' বিচারে পাশ্চাত্ত্য মাপকাঠির প্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কারণ 'রামায়ণ-মহাভারত' ভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজিক জীবন-বোধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 'রামায়ণ-মহাভারতে'র ট্র্যাজিক আদর্শও পরবর্তীকালের সংস্কৃত কবিরা অনুসরণ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কারণ প্রাচ্যদেশে 'Tragedy was a taboo'[৫]। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য ও ময়মনসিংহ গীতিকায় দুঃখ-দারিদ্র্য, শোক-বেদনার কথা উল্লিখিত হলেও সেখানে কবির ট্র্যাজিক অনুভূতি স্পষ্ট নয়। পূর্বজন্মের কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় জীবনদর্শনে ঐহিক জীবন সংগ্রামের ফলাফল পারত্রিক জীবনে উত্তরিত বলেই এখানে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রবলতা লাভ করে নি। ফলে ট্র্যাজিক দুঃখবোধের অনুভূতি প্রাচ্য সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত।

"দার্শনিক বস্তুতান্ত্রিকতা বাঙ্গালী লাভ করেছে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের মাধ্যমে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য এবং দর্শন বাঙ্গালীকে বস্তুমুখী এবং জীবনমুখী করে তুলল, এবং বাঙ্গালীও জীবনের লাভ-লোকসান, প্রত্যাশা-হতাশা, সাফল্য-ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডি সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত হল বাঙ্গালী, শেক্সপীয়রের নাটক হ'ল তাদের নিত্যসঙ্গী, অভিনয়ের উপকরণ। এইভাবে পাশ্চাত্ত্যে যে ট্র্যাজেডির উদ্ভব, তা বাঙ্গালীর চিত্তকেও

আলোড়িত করল, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে যে ট্র্যাজেডি-চেতনা ছিল নিষিদ্ধ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ট্র্যাজেডি-চেতনা ছিল অস্পষ্ট এবং প্রকাশ-কুণ্ঠিত, সেই ট্র্যাজেডি-চেতনা বাঙ্গালীর মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা গেল। চক্‌মকি পাথরের আগুনের মতো পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির ঘা-য়ে বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা আত্মপ্রকাশ করল।”৬

সফোক্লিস, শেক্সপীয়র, ইবসেন– পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি রচয়িতাকে সম্মুখে রেখেই সাধারণত ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। গ্রীক ধর্ম সংস্কারের মধ্য থেকে সফোক্লিসের ‘গ্রীক ট্র্যাজেডি’, এলিজাবেথীয় যুগের রাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য থেকে ‘শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি’ এবং উনিশ শতকের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তার সংঘাত থেকে ইবসেনের ‘সমস্যামূলক ট্র্যাজেডি’র উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ যুগ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ট্র্যাজেডির রূপ-বৈচিত্র্যের কারণ। তাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে ট্র্যাজিক রসোপলব্ধি ঘটলেও, বাঙালীর নিজস্ব রস-সংস্কার বাংলা নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয় নি।

তবু ট্র্যাজেডি হিসেবে ‘নীলদর্পণ’ নাটকের বিচারের পূর্বে গ্রীক ও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির স্বরূপগুলো স্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) সমসাময়িক বলে দীনবন্ধু মিত্রের উপর তাঁর ‘সমস্যা-মূলক ট্র্যাজেডি’র প্রভাব অনুসন্ধান অর্থহীন।

“গ্রীক সাহিত্যে নিয়তির বিচিত্র লীলায় মানুষ অত্যন্ত অসহায়। নিয়তি সেখানে পূর্ব-নির্ধারিত বিশ্ববিধান, যাকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। মানুষ জানে যে নিয়তি-নির্দেশ কখনই অতিক্রান্ত হতে পারে না; কিন্তু তদসত্ত্বেও সে অন্ধভাবে অথবা নিজের অজ্ঞাতসারে নিয়তির বিরুদ্ধাচারণ করে অথবা নিজের অথবা তাকে অতিক্রম করতে চায়। অবশেষে বিপুল শক্তিধর নিয়তি মানুষকে চরমভাবে নিঃশেষ করে এবং তখন মানুষের পরাজয়, হাহাকার এবং যন্ত্রনায় আমরা ভীত হই।”৭

গ্রীক সাহিত্যে ট্র্যাজেডির যে শুভ সূচনা ঘটে, তারই চূড়ান্ত সমৃদ্ধি শেক্সপীয়রের নাটকে লক্ষ করা যায়। “শেক্‌সপীয়রের নাটকে নিয়তি-লাঞ্ছিত মানুষের পরিচয় পাই। সেখানেও মানুষ অসহায়; কিন্তু সেখানে তার অসহয়তার জন্যে সে নিজেই দায়ী। শক্তিমান নায়ক নিজের শক্তির উপর

বিশ্বাসী হয়ে অগ্রসর হ'য়েছে ; কিন্তু আপন চরিত্রের কোনো বিশেষ দুর্বলতার কারণে সে এমন একটা পথ অবলম্বন করেছে যে পথে তার জন্যে সর্বনাশ আছে, কিন্তু আনন্দ নেই।"[৮]

বিভিন্ন ধরণের ট্র্যাজেডির স্বরূপ বিশ্লেষণের দ্বারা একটি সত্যই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দুটি শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়েই ট্র্যাজেডির জন্মলগ্ন উপস্থিত হয়, ফলে নাটকের কোন বিশিষ্ট চরিত্র সৌভাগ্যের চূড়া থেকে দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। "It will be agreed, that in all tragedy there is some sort of collision or conflict—conflict of feelings, modes of thought, desires, wills, purposes ; conflict of persons with one another, or with cirscumstances, or with themselves ; one, several, or all of these kinds of conflict, as the case may be."[৯]—এ, সি, ব্রাডলীর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'নীলদর্পণ' নাটককে বোধহয় ট্র্যাজেডির মর্যাদা দেয়া যায়। কারণ দুটি শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়েই নাটকের বিষাদময় পরিণতি ঘটেছে। তবে 'নীলদর্পণ' নাটকের এই কারুণ্য ও বিষাদময়তা ট্র্যাজেডি নামাঙ্কিত হতে পারে কিনা তাই বিচার্য।

'নীলদর্পণ' নাটকে গ্রীক নাটকের মত নিয়তির সঙ্গে পুরুষকারের সংঘাতের কথা নেই, আছে মানুষে মানুষে সংঘাতের চিত্র। এবং লক্ষণীয় যে, দুটি অসম শক্তি সম্পন্ন শিবির, এই সংঘর্ষে জড়িত। শেক্সপীয়রের নাটকের মত কোন 'ট্র্যাজিক হিরোর সাক্ষাতও এ-নাটকে পাওয়া যায় না। কারণ কোন সুস্পষ্ট নায়ক বা নায়িকা এ-নাটকে নেই। নাট্যকারের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'সমষ্টি' জীবনের ওপর। অথচ ব্যস্টি বা ব্যক্তি চরিত্রই নাটকের নায়ক হইয়া থাকে, সমষ্টিগতভাবে একাধিক চরিত্র তাহার নায়কের স্থান গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা আছে। কারণ, চরিত্রসৃষ্টির যাহা প্রধানতম গুণ, অর্থাৎ সবিশেষত্ব বা individuality তাহা সমষ্টির চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাইতে পারে না। সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ যখন একই প্রকার আচরণ করে, তখন তাহা জনতার আচরণ বলিয়া গণ্য হয়।"[১০] 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছে। যে দুটি শিবিরের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার একটি অত্যাচারীর অপরটি অত্যাচারিতের।

নবীন মাধবকে যদি নায়কের মর্যাদা দেয়া যায়, তবু ট্র্যাজিক হিরোর স্বরূপ তার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হয় না। কারণ নাট্যকার নবীনমাধবকে রক্ত-

মাংসের জীবন্ত চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন নি। তাই যে-চারিত্রিক দুর্বলতার ছিদ্র পথ দিয়ে পতনের বীজ প্রবেশ লাভ করে তা নবীনমাধবের চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠে নি। তাই শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাতেও 'নীলদর্পণ' উত্তীর্ণ হতে পারে না।

তবু দীনবন্ধু মিত্রের ট্র্যাজিক-চেতনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। ট্র্যাজেডি হিসেবে 'নীলদর্পণ' বিচার করতে গিয়ে অধিকাংশ সমালোচক সাধারণত দুটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করে থাকেন ঃ

এক। অসম শক্তির মধ্যে সংঘাত বলে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের প্রতিরোধ যথেষ্ট তীব্র নয়।[১১]

দুই। মৃত্যুর ঘনঘটা ট্র্যাজিক রসকে বিঘ্নিত করেছে।[১২]

'নীলদর্পণ' নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বসু পরিবার ও সাধুচরণ পরিবারের মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই মৃত্যু ও ধ্বংস এক পক্ষের দুর্বলতার পরিণতি নয়, উভয় পক্ষের সংঘাতের ফলশ্রুতি। একপক্ষ তুলনামূলকভাবে স্বল্প শক্তিসম্পন্ন বলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ যথেষ্ট তীব্রতা লাভ করে নি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তোরাপ ও রাইচরণের মত কৃষকের প্রতিরোধ-স্পৃহা এবং বসু পরিবারের মতো ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান নবীনমাধবের সংগ্রামী চেতনা যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। পূর্বজন্মের কর্মফল দ্বারা জীবনের সকল দুঃখশোক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে যে জাতির সাহিত্যে ট্র্যাজেডির জন্ম বিলম্বিত হয়েছে, সে জাতির পক্ষে প্রবল পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে তীব্রতা ও ব্যাপকতার প্রশ্ন বাহুল্য মাত্র।

তাই 'নীলদর্পণ' যতটুকু ট্র্যাজেডি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অন্যায়ের সহিত সংঘাতে ন্যায়ের তীব্র লাঞ্ছনা এবং পরাজয়।"[১৩] শশীভূষণ দাশগুপ্তের এই মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়।

নাট্যকারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণেই 'নীলদর্পণ' নাটকে অনেকগুলি মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। কারণ নাটকটি রচনার পেছনে নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। তাই এ নাটকে তিনি নীলকরদের অত্যাচার, কৃষকসমাজের দুঃখ-দুর্দশা এবং শোকাবহ মৃত্যুর চিত্রকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। ফলে ট্র্যাজেডির

সূক্ষ্ম ও গভীর রস বিঘ্নিত হয়েছে। গোলক বসুর আত্মহত্যা, নবীনমাধব, সাবিত্রী, সরলতা ও ক্ষেত্রমণির মৃত্যু দর্শকের সূক্ষ্ম রসবোধকে ব্যাহত করে, এবং মনকে ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। এর ফলে ট্র্যাজেডি হিসেবে 'নীলদর্পণ' নাটকের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই 'এ-নাটকে কারুণ্য আছে, পতন ও মৃত্যু আছে, কিন্তু ট্র্যাজেডির মূলে যে সূক্ষ্ম ভাব কল্পনা ও গভীরতা থাকে, এখানে তা নেই।"[১৪]

'ট্র্যাজেডিতত্ত্ব' সম্পর্কে বলতে গিয়ে গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটল মন্তব্য করেছেন যে, ট্র্যাজেডি হচ্ছে এক ধরণের 'সিরিয়াস এ্যাকশন' যা দর্শকবৃন্দের মনে সহানুভূতি ও আতঙ্ক উদ্রেক কোরে এই অনুভূতিগুলি থেকে দর্শক চিত্তকে মুক্ত করে এবং পরিণামে ভাবমোক্ষনে (Catharsis) সহায়তা করে।[১৫] এদিক থেকে বিচার করলে ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব হচ্ছে সহানুভূতি ও আতঙ্ক। কিন্তু 'নীলদর্পণ'-এর ঘটনাবলী ভাব মোক্ষণে সহায়তা না করে দর্শকমনে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করে। কারণ এ-নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে দর্শকবৃন্দ অবিচ্ছেদ্য সহানুভূতির সূত্রে যুক্ত হতে পারে না। নবীনমাধবের মত উদার প্রাণ ও নির্ভীক যুবক এবং ক্ষেত্রমণির মতো নিষ্পাপ সরলা কিশোরীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে দর্শক মনে যে প্রশ্ন উদিত হয় তার সদুত্তরের অভাবে তারা বিশ্ববিধানের উপর স্বভাবতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে এবং নৈতিক আদর্শে আস্থা হারায়। ফলে নাটকে ভাবমোক্ষণ বা catharsis সম্ভব হয়ে উঠে না।

তবে 'নীলদর্পণ' নাটকে যে ট্র্যাজেডির অনেকগুলি উপাদান আছে, তাতে সন্দেহ নেই। নাট্যকার নাটকটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার ফলে শিল্পকলার দিক থেকে নাটকটি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর শিল্পিমানস বিচার করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন এ-প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়ঃ "তাঁহার (দীনবন্ধুর) সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে ; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন।"[১৬] নীল চাষীদের প্রতি অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ার ফলে দীনবন্ধু নাটকীয় নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারেন নি। তিনি নিজেই 'সহানুভূতির অধীন' হওয়ায় অত্যাচারিত স্বরপুর গ্রামবাসীদের প্রতি দর্শক বৃন্দের সহানুভূতি আকর্ষণের সবরকম প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। ফলে

নাটকটিতে ট্র্যাজেডির গভীরতার পরিবর্তে করুণরসের তরলতা প্রকাশ পেয়েছে।

এ-নাটকের নায়ক নবীনমাধবের মধ্যেও 'ট্র্যাজিক হিরো' হবার মতো যথেষ্ট গুণ ছিলো। তাঁর দুর্জয় সাহস, অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পৃহা এবং উপদ্রুতের প্রতি অসীম সহানুভূতি তাঁকে নায়ক হবার জন্য যথেষ্ট নৈতিক উপাদান যুগিয়েছে। কিন্তু নায়কের এই গুণ গুলিকে সুস্পষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে নাট্যকারের ব্যর্থতার ফলে নীলদর্পণে কোনো ট্র্যাজিক হিরোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। আর তাই সামগ্রিক বিচারে 'নীলপর্ণ' ট্র্যাজেডির লক্ষণাক্রান্ত বটে, কিন্তু সার্থক ট্র্যাজেডি নয়।

নীলদর্পণ নাটকের নায়ক-সমস্যা

অধিকাংশ উপন্যাস বা নাটকে কোন একটি বিশিষ্ট চরিত্র সকল ঘটনাবর্তের কেন্দ্রে অবস্থান করে উক্ত উপন্যাস বা নাটকের কাহিনী ও বিভিন্ন চরিত্রকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তাই উপন্যাস বা নাটকে সাধারণত কেন্দ্রীয় ও নায়ক চরিত্র এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। "যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনীর সকল ঘটনা ও চরিত্র আবর্তিত হচ্ছে তাঁকে বলবো কেন্দ্রীয় চরিত্র। আর যে চরিত্র কাহিনীর সকল ঘটনা ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ক'রে একটি স্থির-লক্ষ্য-রূপ ফলশ্রুতির দিকে নিয়ে চলেছে তাকে বলবো নায়ক চরিত্র।"১ এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'নীলদর্পণ' নাটকে যথার্থ নায়ক-চরিত্রের সাক্ষাৎলাভ দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। তবে নাট্যকার যে, নবীনমাধবকে নায়করূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু নবীনমাধব নায়কোচিত অনেকগুণের অধিকারী হলেও, নাটকের কাহিনীর গতি-প্রকৃতি তার ব্যক্তি-এককতার প্রাধান্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে।

পরদুঃখকাতরতা ও তেজস্বিতা নবীনমাধক-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নীলকরগণ জোর করে নীলচাষীদের ভাল ভাল জমিতে দাদন দিয়ে নীল করানোর সবরকম প্রচেষ্টা চালাত। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সাধুচরণের কথায় নবীনমাধবের চরিত্রের এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : "বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে, 'যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার

বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব'। তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, 'আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে এবৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।"

এ-নাটকের কোন কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে নবীনমাধবের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ক্ষেত্রমণির মায়ের মুখে ক্ষেত্রমণিকে নীলকর সাহেবের কুঠিতে ধরে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে নবীনমাধব উত্তেজিত হয় উঠেছেন: "পিতার স্বরপুর বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না।"[৩]—এবং তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে তোরাপের সহায়তায় তিনি রোগ সাহেবের কক্ষ থেকে ধর্ষিতা ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সাধুচরণের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নবীনমাধবের ক্রোধান্বিত রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

"বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে ২ সাহেবকে বলিলেন হুজুর আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।' ....বেটা বল্যে 'যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে' এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, 'তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।'...

"অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল।"[৪]

এরকম কিছু খণ্ড খণ্ড ঘটনার মধ্য দিয়ে নবীনমাধবের বীরত্ব, দেশহিতৈষণা, সহমমিতা ও নির্ভীকতার খণ্ড খণ্ড রূপের প্রকাশ ঘটলেও আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করে খণ্ডরূপ অখণ্ড চরিত্র গঠনে সহায়তা করে নি। ফলে নবীনমাধব চরিত্রটি জীবন্ত না হয়ে কৃত্রিম, আদর্শায়িত ও বাক্সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তি চরিত্র হিসেবে 'নীলদর্পণ' নাটকে নবীনমাধবের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু সমগ্র কাহিনীর মেজাজের (spirit) পরিপ্রেক্ষিতে নবীনমাধবের ভূমিকা যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও দ্বিধাহীন নয়। নাট্যকার গোলক বসু-নবীনমাধবের কাহিনীকেই নাটকের মূল কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করে সাধুচরণ-ক্ষেত্রমণির কাহিনীকে পার্শ্বকাহিনী হিসেবে সংস্থাপিত করেছেন। অথচ নাট্যকার 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার প্রেরণা পেয়েছেন সাধুচরণ-ক্ষেত্রমণির মতো লাঞ্ছিত কৃষক পরিবারের হাহাকার থেকে। তাই স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সৃষ্ট নবীনমাধবের মতো একজন মধ্যবিত্ত আদর্শবান যুবকের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ খুঁজে পান নি বলেই সংঘাত ও জটিলতার মধ্য দিয়ে নবীনমাধব চরিত্রটি বিকশিত হয়ে ওঠে নি। বরঞ্চ পূর্ব পরিকল্পিত কতকগুলো বিশিষ্ট ঘটনার মধ্যে সংস্থাপিত করার ফলে চরিত্রটি কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হয়ে নায়কত্বের দাবীকে দুর্বল করে ফেলেছে।

তবু সামগ্রিক বিচারে নবীনমাধবকেই নায়কের মর্যাদা দিতে হয়। কারণ "নবীনমাধব প্রতিরোধ শক্তির অধিনায়ক।...তাহার একক প্রাধান্য স্পষ্টভাবে রূপায়িত না হইলেও তিনিই এই নাটকের নায়ক। অন্যভাবে বলিলে বলা যায়—এই নাটকে নায়ক এক নয়—নায়ক একটি 'দল' (group), নবীনমাধব সেই দলের দলপতি।"৫

চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, "বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকলশ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই।"১ সত্যই তাই। দীনবন্ধুর সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেশার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলেই নাটকে বর্ণিত অধিকাংশ চরিত্রই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জাত। কিন্তু লক্ষণীয় যে, সবরকম চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রত্যক্ষ হলেও, সবরকম চরিত্রাঙ্কণে তাঁর শিল্পিসত্তা সমানভাবে সাড়া দেয় নি।

'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধুর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট দুটি সীমারেখায় বিভক্ত: ভদ্র ও ভদ্রেতর শ্রেণী। গোলক বসুর পরিবারভুক্ত চরিত্রগুলি প্রথম শ্রেণী এবং গোলক বসুর পরিচারিকা, সাধুচরণ-রাইচরণের পরিবার ও কৃষকশ্রেণীভুক্ত চরিত্রগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর চরিত্রই

তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রথম শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টিতে ব্যর্থ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছেন।

ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কণে দীনবন্ধু মিত্রের ব্যর্থতার প্রধান কারণ তিনি এ-ক্ষেত্রে নাটকীয় নির্লিপ্ততা রক্ষা না করে এবং শিল্পীর ধর্মকে ক্ষুন্ন করে একটি পোষিত আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। তাই 'নীলদর্পণ' নাটকের গোলক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল না হয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসের আদর্শায়িত চিন্তাধারার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। তাই গোলোক বসুর সহজ বিশ্বাস, নবীনমাধবের কর্তব্যবোধ ও পিতৃভক্তি, সৈরিন্ধ্রীর পাতিব্রত্য, সাবিত্রীর অপত্য স্নেহ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে কাঙ্খিত বিবেচিত হলেও, প্রকৃত নাট্যশিল্পীর চেতনায় এগুলো প্রাণহীন আদর্শ পুত্তলিকা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, ভাষার দ্বন্দ্বে দীনবন্ধু মিত্র এ-ক্ষেত্রে প্রকৃত নাট্য-শিল্পীর ধর্ম পালন করতে সক্ষম হন নি। তাঁর সম্মুখে বাংলা ভাষায় কোন অনুসরণীয় আদর্শ না থাকায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃত নাটকের দ্বারস্থ হয়েছেন, যেখানে ভদ্রচরিত্র সংস্কৃতে এবং ভদ্রেতর চরিত্র নানারূপ প্রাকৃতে কথা বলে। দীনবন্ধু মিত্র ভদ্র চরিত্রগুলির মুখে সংস্কৃতানুগ সাধুভাষা এবং ভদ্রেতর চরিত্রগুলির মুখে কথ্যভাষা বসিয়ে সংস্কৃত নাটকের রীতিই অনুসরণ করতে চেয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রেও এই পরিপোষিত আদর্শ বাস্তব অভিজ্ঞতার মহিমাকে ক্ষুন্ন করে চরিত্রগুলিকে আড়ষ্ট করে তুলেছে।

তৃতীয়ত, এই শ্রেণীর চরিত্রগুলিকে নাট্যকার নাট্যক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তোলেন নি। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নয়, কথোপকথনের শ্লথ গতিই চরিত্রগুলির গঠন-প্রক্রিয়ায় প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে এ-শ্রেণীর চরিত্রগুলি বাক্‌সর্বস্ব, বৈচিত্র্যহীন ও জীবনরস বিবর্জিত।

ভদ্র চরিত্র অঙ্কণে দীনবন্ধুর ব্যর্থতার কারণ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরিবর্তনশীল শিক্ষিত ভদ্র সমাজের স্বরূপের মধ্যেই নিহিত। "ইংরেজ শাসনকালে বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, সে ব্যবস্থার ও তার প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙলার সমাজ প্রায় নতুনরূপে গড়ে উঠল। কর্ণওয়ালিশের তৈরী জমিদারী-তন্ত্রে জমির মধ্যস্বত্ব ও বিদেশী শাসকের চাকরী-বাকরি জীবিকার প্রধান অবলম্বনরূপে লাভ করে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকদে'র এক নতুন অভ্যুদয় ঘটল।"[২] স্বাভাবিকভাবেই

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই নতুন ভদ্রসমাজ ও তাদের ভাষা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা তখনও গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি। তাই ভদ্র চরিত্রাঙ্কণের সময় তাঁকে বাধ্য হয়েও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। তার অবশ্যাম্ভাবী ফল স্বরূপ চরিত্রগুলি কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে।

অপরপক্ষে ভদ্রেতর চরিত্রাঙ্কণে তিনি দুর্লভ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ 'বাঙালীর যে সনাতন জীবন-সত্য জনগণের চলমান প্রবাহে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে—যার মধ্যে প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ভাবনা-চিন্তা, ভাব-অনুভূতি, এমন কি অসংজ্ঞাত কৌতুক প্রবণতা পর্যন্ত মিলে মিশে আছে—তার গভীরে দীনবন্ধু প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।'[৩] তাই ভদ্রেতর চরিত্রগুলির প্রতি শিল্পী দীনবন্ধু মিত্রের সহজাত সহৃদয়তা ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। আর এই সহৃদয়তা ও সহানুভূতির ঋজু পথ ধরেই তিনি ভদ্রেতর চরিত্রগুলির মুখের ভাষাকে পর্যন্ত যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এ-ভাষা যদিও সর্বদা সুরুচির পরিচয় বহন করে না বা ভদ্র সমাজের উপযুক্ত বিবেচিত হয় না, তবু দীনবন্ধু এ-শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কণে ভাষাকে চরিত্রের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার করে দুর্লভ নাটকীয় নির্লিপ্তিতার পরিচয় দিয়েছেন। "তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"[৪]

সামগ্রিক বিচারে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর সার্থকতা খণ্ডিত। আর এই আংশিক ব্যর্থতার মধ্যেই দীনবন্ধুর শিল্পীজীবনের ট্র্যাজেডি নিহিত। যাদের জন্য স্রষ্টার ব্যাকুলতা, দুর্ভাগ্যবশত দীনবন্ধু তাদেরকে নাটকের কেন্দ্র সংস্থাপিত করতে পারেন নি। অথচ নাটকে তারা পার্শ্বচরিত্র হয়েও শিল্পী হৃদয়ের গভীর উত্তাপে সজীব ও সাবলীল মানুষরূপে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। অপরপক্ষে যাদেরকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী গঠিত হয়েছে, সেই ভদ্র চরিত্রগুলি শিল্পীর অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। পারলে তাঁর পক্ষে ভাষার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো। ফলত ভদ্র চরিত্রগুলি বাক্সর্বস্ব জীবনরস বিবর্জিত পুত্তলিকায় পরিণত হতো না।

নাটকে সংলাপের গুরুত্ব ও নীলদর্পণ নাটকের সংলাপ বিচার

সংলাপের মাধ্যমেই নাটকের কাহিনী ও বিভিন্ন চরিত্র গড়ে ওঠে। বাস্তবানুগ সংলাপ যেমন নাটকীয় চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলে, তেমনি

নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশে ও নাটকে গতিবেগ সঞ্চারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই নাটকে সংলাপের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। নাটকে সংলাপের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক Thora Burnby Jones বলেন: 'Dialogue is the essence of the play. The skill of the dramatist lies mainly in the choice of words to define character, to communicate the idea, to emphasise the conflict and tension and to give the play form, without which it would have no existence." [১]

সার্থক সংলাপ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে-গড়ে ওঠে। তাই সার্থক ও বাস্তবানুগ সংলাপ নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে দর্শকবৃন্দের সহমর্মিতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

স্বাভাবিকতা সংলাপের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সংলাপে নাটকীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই নাটকীয়তার জন্যই ভাষার শব্দগুলিকে কখনও অতর্কিত, .কখনও অতিশয়িত, কখনও পুনরাবৃত্ত এবং কখনও বা সংক্ষিপ্ত হতে হয়।'[২] অর্থাৎ নাটকের ভাষা বাস্তবানুগ হয়েও বাস্তবাতীত—'higher reality'।

চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে নাটকীয় সংলাপ দু'ভাবে কাজ করে থাকে। এক। অপরের সঙ্গে কথোপকথনকালে বক্তার নিজের চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। এখানে ভাষাভঙ্গি সংলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। দুই। একজনের সংলাপের মধ্য দিয়ে অন্যকোন চরিত্রের পরিচয় প্রকাশিত হতে পারে। এখানে বক্তব্য সংলাপের লক্ষণীয় বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

তবে একথা সত্য যে, সংলাপ প্রাণবন্ত, যথার্থ ও বাস্তবানুগ কি-না তার পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন তা' বক্তার বিচিত্র আবেগের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সার্থক নাটকীয় সংলাপ চরিত্রপোযোগী, অর্থবহ অথচ আবেগদীপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

'নীলদর্পণ' নাটকে স্পষ্টত যে দুইশ্রেণীর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে তাদের মূল্যায়ণে সংলাপই বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং এ নাটক বিচারে সংলাপের গুরুত্ব যথেষ্ট।

যেহেতু সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম ভাষা, তাই নাটকের সংলাপ গঠনেও

ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। নীলদর্পণের প্রকাশ কাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। এ-সময় বাংলা গদ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল মাত্র। স্মরণীয় যে, উনিশ শতকের এই দশকে বাংলা গদ্য নির্মাণে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা গদ্য তখনও একটি বিশিষ্ট মাণদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। 'একদিকে ছিল নিতান্ত অসাধু সাধু-ভাষার জের, অন্যদিকে নিতান্ত অচল চল্‌তি ভাষার প্রচার।'৩

ঠিক এই সময়ে নাট্যসাহিত্যের অঙ্গনে দীনবন্ধু মিত্র আবির্ভূত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নাটক রচনার সময় গদ্যসম্পর্কীয় এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাশালী গদ্যশিল্পী হলেও তিনি এই জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর সীমাবদ্ধতাই তাঁকে সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করে। ফলত তাঁর নাটকের সংলাপও এই সমস্যার চিহ্ন বহন করে। উপরে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপ উদ্ধৃত করলেই এই সমস্যার স্বরূপ উদঘাটিত হবে :

(ক) নবীন। কি অবিচার! নব প্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে। (দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

* * *

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চারদিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব। (চতুর্থ অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

* * *

সৈরিন্ধ্রী। মা স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাকবে, প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্মিক, পরোপকারী,

দীনপালক, তোমাকে অনাথ-বন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও তোমার দেবারাধণার পুষ্প তুলিয়া দিবে।

আহা, আহা, মরি মরি একি সর্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ-বান্ধব কর বিপদে বিধান॥...

(পঞ্চম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

(খ) আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যালার হাকিম ম্যাচের টক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি। তেরো নাল ফির্‌তি থাকে, মা গো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দিলে, এতো জ্যালার হাকিম। (প্রথম অঙ্ক : চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)

* * *

প্রথম রাইয়ত। কুঁদির মুখি বাঁক থাক্‌বে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাইনি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়য়ে উটেলো—হ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়্‌চে—গোডার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয় রাইয়ত। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেক মারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়্ মিড়্ করিয়া) দুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করো্য, নৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বলবো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমনি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দেবার করি।

(দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক)

* * *

ক্ষেত্রমণি। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর

বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্যে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো ২ করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার না মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারিনে। (তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

প্রথমোক্ত সংলাপ তিনটি কৃত্রিম ও সম্পূর্ণ প্রাণরস বর্জিত। দীনবন্ধু সংস্কৃত নাটকের মতো ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে চরিত্রগুলোর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট ভদ্রচরিত্রগুলি ভাষার আড়ম্বরে ও কৃত্রিমতায় অবিশ্বাস্য, আড়ষ্ট ও হাস্যকর হয়ে উঠেছে। ফলে বসু পরিবারের নবীনমাধব, বিন্দুমাধব বা সৈরিন্ধ্রী—কেউই পাঠক ও দর্শকের মনকে আলোড়িত করতে পারে না।

অপরপক্ষে ভদ্রেতর শ্রেণীর সংলাপ স্বাভাবিক, নাটকীয় গুণ সমৃদ্ধ ও চরিত্রানুগ হওয়ায় এ-ধরণের চরিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ফলত এ-নাটকে স্বাভাবিকভাবেই সার্থক নাট্যরস সৃজনে ভদ্রেতর চরিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই যথার্থই বলেছেন, "তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না।"[৪] ভদ্রেতর চরিত্রের মুখের ভাষা বাস্তবধর্মী ও যথাযথ হওয়ার ফলে "নীলদর্পণ' নাটকে "আস্ত তোরাপ, আস্ত আদুরী"[৫] দেখা যায়। অর্থাৎ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র সংলাপ রচনায় আংশিক সার্থকতা লাভ করেছেন।

উপসংহার : দীনবন্ধু-প্রতিভার স্বকীয়তা ও সীমাবদ্ধতা

"দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানতাম ; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে"[১]—দীনবন্ধু-প্রতিভার স্বকীয়তা নির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যটি দিগ্‌দর্শন স্বরূপ। সত্যই দীনবন্ধু চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর পর দুঃখকাতরতা। কিন্তু এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানুষ দীনবন্ধুকে মহত্ত্বের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেও শিল্পী দীনবন্ধুর জন্য যুগপৎ দোষ ও গুণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুণ এই কারণে যে পরদুঃখকাতর দীনবন্ধু মিত্র সমসাময়িক বিপর্যস্ত বাঙালী সমাজের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁর রচনায় তাদেরকে স্থান

দান করলেন। ফলে পৌরাণিক কাহিনী ও রোমান্সের পরিবর্তে তাঁর নাটকে দেখা গেল বাস্তব জীবনাচরণের পরিচয়। এভাবে গোলক বসু-নবীনমাধব-নিমচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী ও ক্ষেত্রমণি সাহিত্যে তাদের স্থান করে নিল। দীনবন্ধুই প্রথম দেখালেন যে, স্বদেশপ্রেম শুধু ইতিহাস চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, দেশের আপামর জনসাধারণের সেবা তারই অঙ্গীভূত। এভাবে "দীনবন্ধুই প্রথম বাঙালীকে দেশের কথা ভাবিতে শিখাইলেন। তিনি প্রথম শহরের শিক্ষিত মানুষকে গ্রামের চাষীর দুঃখ বুঝাইলেন। তিনি প্রথম বিদেশী বণিকের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ রাজপুরুষের নিন্দা করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ-চালিত সংবাদপত্রের হীনমন্যতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। আবার রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিকের অন্যায় উৎপীড়নের কথা বলিতে যাইয়া তিনিই প্রথম তাহাদের বাঙালী সহায়কদের লোভ ও কাপুরুষতার এক গ্লানিকর চিত্র বাঙালীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন। এই নাটকেই (নীলদর্পণ) প্রথম বাঙালী দেশসেবক সাহেবের বুকে পদাঘাত করিল।"[২]

কিন্তু সমসাময়িক জীবনের চিত্রণই সাহিত্যের শেষ কথা নয়। প্রকৃত সাহিত্য সাময়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করে অসীমতার ব্যঞ্জনা দান করে, সম্ভাবনার দিগন্তকে ক্রমশ প্রসারিত করে। কিন্তু দীনবন্ধুর 'সর্বব্যাপী' সহানুভূতি উপদ্রুত কৃষক সমাজের অসহায়তার চিত্রকে প্রাধান্য দান করে তাদের সংগ্রামশীল সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। হয়তো এতে কখনো কখনো শাশ্বত বেদনার কারুণ্য স্পষ্টরূপ লাভ করেছে, কিন্তু সামাজিক বিবর্তনে কৃষক সমাজের গৌরবজনক ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রতিভাধান শিল্পীর জন্য পরদুঃখকাতরতা ও সর্বব্যাপী সহানুভূতি যথেষ্ট নয়, গভীর জীবনদর্শনও প্রয়োজন। রুশ কৃষকজীবনের রূপকার টলস্টয়ের মধ্যে শিল্পীর এই গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। সুস্পষ্ট জীবনদর্শনের অভাবে দীনবন্ধুকে তাই অল্পেই তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আর নাট্যশিল্পীর সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁর সৃষ্ট কৃষক সমাজ সম্ভাবনার অসীম দিগন্তকে উন্মোচিত করতে সমর্থ হয়নি।

নীল-দর্পণ

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিরা তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ, কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে তোমাদের মধ্যে কেহ২ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ তার্পিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত

আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজস্‌কে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদক-যুগল সহস্র মুদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ," প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর্ জেনরল্ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্র্যান্ট মহামতি লেফ্‌টেনেণ্ট গভরনর্ হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্য-পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিবিল্ সর্‌ভিসসরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

গোলোকচন্দ্র বসু	
নবীনমাধব	গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
বিন্দুমাধব	
সাধুচরণ	প্রতিবাসী রাইয়ত
রাইচরণ	সাধুর ভ্রাতা
গোপীনাথ দাস	দেওয়ান
আই, আই, উড	নীলকর
পি, পি, রোগ	
আমিন	
খালাসী	
তাইদ্‌গীর	

মাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইনেস্পেক্টর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, চারি জন শিশু, লাটিয়াল, রাখাল।

কামিনীগণ

সাবিত্রী	গোলোকের স্ত্রী
সৈরিন্ধ্রী	নবীনের স্ত্রী
সরলতা	বিন্দুমাধবের স্ত্রী
রেবতী	সাধুচরণের স্ত্রী
ক্ষেত্রমণি	সাধুর কন্যা
আদুরী	গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী
পদী	ময়রাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক
গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমা জমি কর্য়ে গিয়াছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়, যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়াছে. গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁখান ছারক্ষার কর্য়ে তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু বেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০।৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।

গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল; উহাদের খালাস কর্যে আস্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আস্তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গাঁয় আর বসত্ করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জমিতে যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।"

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ

বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো! তাই যদি নীলের দামগুণো চুক্‌য়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

নবীনমাধবের প্রবেশ

কি বাবা, কি কর‍্যে এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা কর‍্যে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? .আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হল্যে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমার-দিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাক্‌রি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই গত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। মাঠাকরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো আপনারা নাবা খাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান, বড়বাবু নমস্কার করি গো।

সাধুচরণের প্রস্থান

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী

লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন স্মুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মার্‌লে। সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি কর্‌্যে ত্যাক্‌বো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাযিই ত্যাশ্ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নেই। কাকিমারে দেখ্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। স্মুমুন্দিরি অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ী এলি ?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না, য্যান সোণার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাং কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোডার নীলি কল্লে কি ? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতী বা কখন করবো। তুই কাঁদিস্ নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েছে যে, আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বল্যে এলি।

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়্‌য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজতুরি করবো বল্যে সেঁস্‌য়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ ছাখ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে কর্‌য্যে এনেচে, কুটি ধর্‌য্যে নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুইজন পেয়াদার প্রবেশ

আমিন। বাঁদ, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন

রেবতী। ও মা ই কি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ,

কি সর্ব্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়্‌য়ে দ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ কর‍্যে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়! একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাবো—তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্‌।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

আমিন। চল্‌ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল।

যাইতে অগ্রসর হইল

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও আমিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ও মা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দু বার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেছে—কি করবো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)।

আমিন। আরে মাগি তোর নাকি সুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।

রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গলার বারেন্দা

আই, আই, উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে্য শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি, জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত হাম কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্কিছাড়া আমারে কিছু বলি নি—তুমি শালা

বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্কা হায় নেই বাবা —তোম্কো জুতি মারকে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্মি ক্যাওটকো এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কায করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্য়ে চায়—ওস্কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্কা হিসাব দোরস্ত করকে রাখ—বাঞ্চৎ বড়া মাম্লাবাজ, হাম্ দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটীর প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তে মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, নবীনবাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কর না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেঠা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্ছে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কায চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম
করিতে২ প্রবেশ

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি? তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাযেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাযেই চট্‌তে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো, হুজুরের কি।

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ কর্য়ো রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্থ কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইতদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া

দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"—

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।—ধর্ম্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে. আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না!

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লি নে! (কান মলন)

রাই। (হাঁপাইতে২) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো। (শ্যামচাঁদাঘাত)

নবীনমাধবের প্রবেশ

রাই। বড়বাবু, মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুন্‌বে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল করে্য দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার

বাড়ীতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমরনগরের মাজিষ্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুটির লোক ধর্‍্যে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ!

গোপী। নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কায কি, আপনি বাড়ি যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

নবীনমাধবের প্রস্থান.

উড। গোলামকি গোলাম। দেওয়ান, দপ্তুরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

উডের প্রস্থান

গোপী। চল সাধু, দপ্তুরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ি বিনাইতে নিযুক্ত

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি একগাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম কর্য়ে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্ করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাক্‌বে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোকে বলে যা-কে যায় দেখ্‌তে পারে না, আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বয়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

সিকাহস্ত সরলতার প্রবেশ

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কিনা !—হয় নি ?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্, এই খানিটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে ?

সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুর্য়ে গেছে তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন সকলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায় ?

ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ী আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুণচো—আর বোন্‌, মনের কথা বেরুয়ে পড়েছে !

সর। মাইরি দিদি আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা। ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিঠিগুলিন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে। দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখি নি। দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ—(সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

আদুরীর প্রবেশ

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মরবো ?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন কর্য়ে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে ? তুই রক কারে বলে জানিস নে, তুই ডান বুঝিস নে ?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মাঠাকুরুণিরি বলবো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোথান করিয়া) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস 'নে। মিন্‌সের মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড্‌ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ দিতে চেয়েলো।

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি॥

দেখদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতে দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরাণ ঘুমুলে।"

সর। তুই ভাতারের নাম ধর্যে ডাকতিস!

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস?

আদুরী। মুই বলতাম, হাদে ওয়ো শোন্‌চো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চেন তাই মুই বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়রে মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে২ শোনা হচ্চে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

আয় ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি তা তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমাদের বাড়ী এল না ?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কের্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মাদ্দের পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আহুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে—মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই যেটের বাছা—আহুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্‌ গে।

আহুরীর প্রস্থান

পোড়াকপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—ক মাস হলো ?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো। তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্‌বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পূরি নি ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন ?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো,

ঠাকুরুণিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মর‍্যে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

আহুরীর পুনঃ প্রবেশ

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আহুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আহুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক, হা, হা, হা, হা।

সরলতার জিব কেটে প্রস্থান

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো—

সাবিত্রীর প্রবেশ

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস্‌, তোর মেয়ে এনিচিস্‌ বেশ করিচিস্‌—বিপিন আবদার নিচ্‌লো তাকে শান্ত কর‍্যে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্‌ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পর্‌ণাম কর।

ক্ষেত্রমণির প্রণাম

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আহুরী") মা যাও গো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আহুরীর প্রতি) আহুরী তোরে ডাক্‌চে।

আহুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি আর এক দিন আসিস।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই—মুই তো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম, ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্‌তে দেয়—বেটীর আর বাকী আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গস্তানি বিটী বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেচে।

আহুরী। থু, থু, থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতে পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম কর্য়ে দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দিতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েছে কাল থেকে ঝম্‌কে২ ওট্‌চে।

আহুরী। মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা সর্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেট্‌য়ে দিস তবে নেটেল্লা দিয়ে ধর্য়ে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে মরদ্‌দের

কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধর্য্যে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে অ্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা বল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন্ নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে না কি কুটেল সাহেবরা ম্যাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতি পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি না কি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, না কি এ ম্যাদের পিল্ হয় না—

আহুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেব্‌য়েচে।

সাবি। আহুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম না কি বড্ডো শোনে—

আহুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, লজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি, তেরোনাল ফির্‌তি থাকে, মা গো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—

এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগী কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলুবাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না।

সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে, তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়াছে—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিড়ি দিয়ে অমন করে যাওয়া আসা করো না।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, তুই যায়ে এই বেলা বেলা থাক্‌তে২ গা ধুয়ে এস।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির গুদামঘর

তোরাপ ও আর চারি জন রাইয়ত উপবিষ্ট

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না—জান কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্ থাক্‌বে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাই নি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়্‌য়ে উটেলো—ছ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়্‌চে—গোড়ার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস্ নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্‌ করিয়া) ছুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করে্য, লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বল্‌বো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এম্‌নি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্‌ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোরলে ক্যান—তানার সেমনতোনের দিন ঘুনয়ে এসতেচে, ভেবেলাম

এই হিরিকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, কর্য়ে সেমন্তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বুর খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সক্লি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজছুরিতি ঠেলেলো। মুই সেরেব কেচ্রির ভেতর অনেক তাম্সা দেখেলাম। ওয়াঃ! হ্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, হুই সুমুন্দি মোক্তার ওমনি র, র, কর্য়ে অ্যাসেছে, হেড়া হেড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্লো।

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মত হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নট্তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচি নে গা—

ভাল২ করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে।

এব্রে ও সুমিন্দির ইক্সুল করা বেইরে গেছে, সুমিন্দির গুদোম্তে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমিন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরেলো—সুমিন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি লেগেছে, বাবা!

তোরাপ। সমিন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেরটক্ সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট্ কত্তি লেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝ্তি পারচি নে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডের গাঁতবার জন্যি খানা পেক্য়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্য়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড়নোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী

যাবে ক্যান। মুই ওর অন্তেরা পেইচি, এ সমিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটি২ আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়্য়েলো ক্যামন করে? দেখিস্ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজ্য়ে মোদের কুটিতি এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্য়ে নাকে, মোল্লা প্যাটের ভাত কর্য়ে খাতি পারবো, আর সমিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপ্তি পারবে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদো ভূতি পালি না কি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান? মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো!
নীলকুটির নীল মেম্‌দো॥

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচচে শুনিস্ নি।

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥"

তোরাপ। এগুল নচন নচেচে; "জাত মাল্লে" কি?

"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জান্তি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা, বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাললাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতি বস মশার

কাছে মিচ্‌রি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রূপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুক্‌য়েচে ?

চতুর্থ। গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচ্‌ড়া কল্লে—এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, ঝা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেড়্‌য়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে। চাসার কি আর বাচন আছে ?

তোরাপ। এডা কেবল আমিন সমিন্দির হির্‌ভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সমিন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমিন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল করবি তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেন্‌য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সমিন্দি তা কর্‌বে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোস্‌চেন তাই চোস্‌চেন—(নেপথ্যে হো, হো ; হো, মা, মা) গাজিসাহেব গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম নাম কর, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্ব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারনের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্‌ কুটিতে আছি তাও তো জানিতে

পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মা গো তুমি কোথায়)

তৃতীয়। 'আম, আম, আম, কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর !—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখি নি।)

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুন্‌লি তো মর্‌য়ে ভূত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারি নি।

প্রথম। তুই মিন্‌সে এমন হেব্‌লো।

তোরাপ। ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি ওর বাড়ী কনে—

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) ছ্যাল ধরিস্, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, শুপে স্নুমিন্দি আস্‌চে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ

তৃতীয়। দেওয়ানজি মশাই, এই ঘরডার মধ্যি ভূত আছে। এত বেল কান্‌তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস্ তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়েছে, এ কুটিতে আর রাখা নয় ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমক্‌হারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদনা, অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করবো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মা গো গ্যালাম, পরাণে চাচা, এট্‌টু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতার গুঁতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা মুই তাই করবো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে; মোরে খুন কর্যে ফ্যালালে, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, মেলে রে (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হ্যায়।

রোগের প্রস্থান

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার তুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি নি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর

লিপিহস্তে সরলতা উপবিষ্ট

সর। সরলা ললনা জীবন এল না।
কমল হৃদয় দ্বিরদ দলনা ॥

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল, এক্ষণে যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামিরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপি চুম্বন) তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন)

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন

বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে২ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে? —আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাঁসি সুখের রমনী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। এ অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে

পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদার্ণি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না, কল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউ নি। চুলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে, চিঠিখান অ্যাকন ছাড় নি—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটিতে ন্যাকি নি—কত্তামশাই যে কান্‌তি নেগলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না (প্রকাশে) চল রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাখি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ

পদী ময়রাণীর প্রবেশ

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই—আমারে

দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোণার হরিণ মা না কি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মা গো কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো, বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে ত্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানষের পাছায় নাতি মারতে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না—আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে। (নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ও তার নয়ান দুটি।

এক জন রাখালের প্রবেশ

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে ?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিইচি—

এক জন লাঠিয়ালের প্রবেশ

বাবা রে! কুটির নেটেলা।

রাখালের বেগে পলায়ন

লাঠি। পদ্মমুখি, মিসি মাগ্‌গি কর্‌্যে তুল্যে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুট্‌তে যাব, যদি কাল কালো বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

লাঠিয়ালের প্রস্থান

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কায নাই। কম্‌য়ে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্‌সীরে ১০খান জমি ছাড়বার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ারমুখো পোড়ারমুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না।

৪ জন শিশু। (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বল্‌তে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই॥

নবীনমাধবের প্রবেশ

পদী। ও মা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম।

ঘোম্‌টা দিয়া পদীর প্রস্থান

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী—(শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও অনেক বেলা হইয়াছে—

৪ জন শিশুর প্রস্থান

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়েসের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচ জনের এক জনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এ পর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

এক জন রাইয়ত, দুই জন ফৌজদারির পেয়াদা এবং
কুটির তাইদ্‌দিগের প্রবেশ

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবাব আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, এক বার লাগলে আর

ওটে না—তুই বেটা চল্, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করি নে, জেলে পচে মর্‌রো তবু গোড়ার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা কাঙ্গালের কেউ দেখে না (ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের একবার দ্যাক্‌তি পালাম না।

নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে।

রাইচরণের প্রবেশ

রাই। দাদা না ধল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি য্যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুট্‌ঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী শুডি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে।

রাইচরণের প্রস্থান

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখনও গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন, হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন,

ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীল কুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্‌মুখ হব না—শামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

দুই জন অধ্যাপকের প্রবেশ

প্রথম। ওহে বাপু, গোলকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমূপজয়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হঃ, হঃ, হঃ, (নস্যগ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলকচন্দ্রের আলয় অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও, তা বলে "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্‌য়ে নে বেড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব।

খালাসীর প্রস্থান

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্‌বো—বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায়২ শ্যামচাঁদ দেখায়। সেদিন মোজা সহিত লাতি মার্‌লে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"

উডকে দর্শন করিয়া

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

উডের প্রবেশ

ধর্ম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার

এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি পড়ে রহিয়াছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্‌সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।" নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি তাহা হইলে বেটা কাযে কাযেই শাসিত হইবে, এইজন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশল বাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল; দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ্ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিস করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী কর্‌লে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোব্বর কর্‌্যে

নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মবতার, নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে, বাঞ্চাৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম বেহেতোর চলেগা!

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর২ দাদন বৃদ্ধি করি এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে; যে ব্যক্তি দু টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান করে তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি, আমিন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে২ রথতলা পর্য্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময় গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর॥

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল ?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আমিন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কায ? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিমক্‌হারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ্‌ নেমক্‌হারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার বেয়াদবি মাফ্‌ হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চাৎ আর পডী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বট্‌নেকা ঘরমে ভেজ ডেয়।

উডের প্রস্থান

গোপী। দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ করো্যে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণগুলিন দিতে পারি নে ?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট. বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস করে্য ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি আমার আর ছোট বয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি কি নিদারুণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ, তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন, কৌতুক ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম। আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না—প্রণয়িনি এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে্য তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাণনাথ বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে

বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শ্বাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেটমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট, কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কার্য করে্য তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, এ কি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি—

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখী চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ আর একদিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আদুরী আস্‌ছে।

দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। চিঠি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কতি পারি নে মাঠাকুরুণ তোমার হাতে দিতে বল্লে।

লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয় এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরাণীর গত কল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে তদাগুকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যাই লিখিয়াছি—তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়

কি দুর্দ্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার! দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করো নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক্—

নবীন। (লিপি পাঠ)

প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণ পালিতস্য

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ। বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গল নিজ মঙ্গল পরং লিপিপ্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব বক্রী এক শত

টাকা আগামি মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি ইতি।

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—যাই আমি ছোট বউকে বলিগে।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা; এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড় শত টাকা হাতে আছে—তামাক কয়েক খান আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে—যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয় তবে বুঝিলাম যে এদেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি—যাহাদিগের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয় তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে। আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে—ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি—কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন ২ মাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান্ হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়। হে লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত

না, হে দেশপালক! যদি এমত একটি ধারা করিতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না—আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবি। নবীন সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী করে্য ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা আমারো সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি, হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি করবো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম। পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড়বাবু মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফাটে বার হলো —মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চার জন নেটেলাতে বাছারে ধরে্য নিয়ে গিয়েছে। পদী সর্ব্বনাশী দেখয়্যে দিয়ে পেল্‌য়েচে। বড়বাবু পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবে ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে—লোকের

জমি কেড়ে নিচ্চিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু বাচুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাটির আগায় নীল বুনয়ে নিচ্চিস্—তা লোক কেঁদিই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে—এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা, আদপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ মার্‌লি তাই বোন্‌লাম—রেয়ে ছোড়া জমি চসে আর ফুলে ২ কেঁদে ওঠে—মাটেতে আ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্ত মণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া। পিতার স্বরপুর বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না।

নবীনের প্রস্থান

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙালিনী পেলে রাণী এমন রতন।

যদি নীল বানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল ঘোষ বউ বাইরের দিকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কাম্‌রা

রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ

ক্ষেত্র। ময়রাপিসি, মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি২ কর, মোরে

পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাব্‌বে ?

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়; এ কথা কেউ জান্তে পার্‌বে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জান্‌তি পার্‌লে না—ওপরের দেব্‌তা তো জান্তি পার্‌বে, দেবতার চকি তো ধুলো দিতি পারবো না ! আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাস্‌বে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্‌, আর অজানাই হোক্‌, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্‌ না।

পদী। আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ানো, হা হা হা আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে ২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাঁসিতে ২ খানা খাই—আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্ম্মে ওকর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে; সমুদ্রে সব মিশ্‌য়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই—পদ্দ, টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহের তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোষাকের—চট পর্য্যে থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পর্‌তি না হয়। ময়রা পিসি

মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা! মোর মা এত বেল্ গলায় দড়ি দিয়েচে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মতো ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি, পদি পিসি তোর গু খাই—মা রে মলাম জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে, (প্রকাশে) তা, মা, আমি কি করবো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্ তখন আর এক দিন আস্‌বে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়ে দিব—ড্যাম্‌নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস্ নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদী ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি যাস্ নে, ময়রা পিসি যাস্ নে।

পদী ময়রাণীর প্রস্থান

মোরে কাল সাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্‌তি লেগিচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘুরতি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধূলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্‌য়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার নজ্জা যাইবে না।

বস্ত্র ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

রোগের হস্তে নখ বিদারণ

রোগ। ইন্‌ফরন্যাল বিচ্‌! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এই বার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার্ মুই স্বগ্‌গে চলে যাই —ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্য়ে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো ২ করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্ না মোর প্রাণ বার কর্য়ে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো (কম্পন)।

জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা ? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা ? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার !

তোরাপ। সমিন্দি দেঁড়ুয়ে যেন কাটের পুতুল—গোডার বাক্যি হরে গিয়েচে—বড়বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেম্‌নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোঁচা (গলদেশে ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাক্‌বি তো জোরার বাড়ী যাবি (গাল টিপে ধর্য্যে) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা (কানমলন)।

নবীন। ভয় কি ভাল কর্য্যে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা কর্য্যে লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়ুয়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়ে যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়্যে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করি বুনোরা ঘুমুয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বল্‌বে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্‌ তাহা আমি শুনতে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁৎরে পার হয়্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির কথা আর কি শোন্‌বা—মুই মোক্তার সমন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেল্‌য়ে গ্যালাম, তার পর নাত কর্য্যে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল কর্য্যে কি আর খাবার যো

নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড কর্য়ে জুতার গুঁতো মারিস্ নে ?

হাঁটুর গুঁতা

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় বল্যে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম।

ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান

তোরাপ। এমন বস্‌গারও বেছাপ্পর কত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বল্যে মেন্‌য়ে জুন্‌য়ে কায মেরে নে, জোর জোরাবতী কদিন চলে, পেল্‌য়ে গেলি তো কিছু কত্তি পারবো না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সমিন্দি নেয়ত ফেরার হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে। বড়বাবুর আর বচুরে ট্যাকাগুনো চুক্‌য়ে দে আর এ বচোর ঝা বুন্‌তি চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়েচে, দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।

চীৎ করিয়া ফেলিয়া পলায়ন

রোগ। বাই জোভ ! বিটেন টু জেলি।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর ভবনের দরদালান

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে—আমি পতি পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম ; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা ! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে

নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফোজদুরিতে ধর্য়ে নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা! বুক চাপ্ড়ে ২ রক্ত বার করেছেন, কেঁদে ২ চক্ষু ফুল্য়েছেন, যাবার সময়ে বলেন গিন্নি এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আস্‌বো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে; টাকার যোগাড় করিতেই বা কত কষ্ট, ঘুরে ২ ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়লে বাবার কতই খেদ—বলেন কিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনাগুলিন আগে খালাস কর্য়ে আন্‌বো—বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতে ২ যাত্রা করলেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ!

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবি। (ক্রন্দন করিতে ২) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস স্নান করসে।

তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ

ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দ্দন

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছে। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্ধ হবে বাড়ী আস্‌বেন আশা করে্য রইচি তাতে এই দায় উপস্থিত। (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখে শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বুঝি কিছু খাউ নি। ঘোর বিপদে পড়ে রইচি তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল আমিও যাই।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি

উড, রোগ, ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বাদীপ্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসি, আরদালি, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান।

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)।

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে (দরখাস্তের পাত উল্‌টায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত. বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কাল যাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য সাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়, ধর্ম্মাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের

দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্ মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়। করুণা, মার্জ্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্ম্মাবতার আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তামিল দিতে সাহস হয় না, যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজুকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম্ প্রোভোকেশান্, এক্সট্রিম প্রোভোকেশান্।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত, আইনকারকেরা বলিয়াছেন "বিচারকর্ত্তা আসামীর আড্‌ভোকেট্ স্বরূপ", সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পূনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্ম্মবতার, সাক্ষিগণ চাসউপজীবী দীন প্রজা তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রীপুত্রের প্রতিপালন করে, তাহাদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না

থাকিলে তাহাদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে; চাসারদিগের এক দিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাবতার, যেমত বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম ২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে ২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলা-পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাস রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য্য এবং

প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মাবতার তাহারদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু, করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেক বার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না; ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসুর যে সুচরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন "পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপি বন্দ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাযে কাযেই বলিলাম তবে সাহেবের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, গোপনে ২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর ২ সাহেবকে

এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিনে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার, ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই ২ কারণে আমি তাহারদের পুনর্ব্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি—ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাবতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট্র আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এ দেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি!

চাপ। খোদাবন্দ্।

সাহেবের নিকট গমন

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্‌ দেও—খানসামাকো বোলো বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়।

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (মাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখৎ হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস কর।

মাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসি ও আরদালির প্রস্থান

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই (নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজি হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন

নবীন। আমার কাযে কাযেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যত টাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতিও করিলাম—বলেন, "নবীন তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপমুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে ছুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিষ্ট্রের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণ কলেবর, স্পন্দনহীন মৃতকপোতবৎ কারাগার পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছে। বিন্দু, তোমাকে রাত্র দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বল্যে ধরে

দেন, আমি একবার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু তুমি এমনি সাধুই বট। আহা! ক্ষেত্রমণির সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখতে পাব, আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্ব্যাধি হইবে, ডাক্তারবাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর‍্যে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

ডেপুটী ইনস্পেক্‌টারের প্রবেশ

ডেপু। বিন্দুবাবু, আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমরনগরের আসিস্‌টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গভরনর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল মাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান

ডেপুটি। আহা দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গভরনরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিত করিবে। নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী,

বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীনবাবুর সদ্‌গুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।

কালেজের পণ্ডিতদের প্রবেশ

আসতে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণুবাবুর জন্যে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয় আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ শ্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন —সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জ্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন কর্য়ে কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

বিন্দুমাধবের পুনঃ প্রবেশ

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার। কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়েছিলে কাহাকে।

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত। সকল দেবতাই সমান, ঠক্ বাচতে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না তাহাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকুল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনই জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদ করিব।

একজন চাপরাসির প্রবেশ

তুমি জেলের চাপরাসি না?

চাপ। মশাই এট্টু জল্‌দি করে জেলে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ।

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বলতি পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু। (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম।

চাপরাসি ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান।

জেলদারোগা এবং জমাদার আসীন

দারো। বিন্দুমাধববাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরদ্দি গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চার দিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দুবাবু পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছে, এ দশা দেখ্‌লে প্রাণত্যাগ করিবেন।

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! (নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রন্দন) পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন! বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে “স্বরপুর বৃকোদর” বলা শেষ হইল? বড় বধূকে “আমার মা, আমার মা”, বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ তাহার সন্ধি করিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধকর্ত্তৃক

হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটীবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট

পণ্ডিত। (ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়—

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন।

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভৎ‍র্সনা করিতেছেন—

ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব। গড্‌স উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের ভিক্ষারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লানটার সাহেবদের

কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুই জন রাইয়ত বাজারে যাইল, একজনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো" দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল রাইয়ত দুই জন দাদনের ভয়ে পালাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকে প্লান্‌টার লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপু। ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে নীলভূত বেরিয়েছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বনান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণ রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "এক ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টার বন্ধনমোচনপূর্ব্বক মৃতদেহ
লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন কর্‍্যে ?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগিচি, নুন না থাক্‌লি নুন চেয়ে আনচি, তেলপলাডা তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগ্‌লো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়্যে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে ?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায় ?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কল্‌কাতার পচ্চিমি, যারা কায়েদ্‌গার পইতে কত্তি চেয়লো—যে বামুন আচে ইদিরি খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়্‌য়ে তোলে—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল্‌ সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না, পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয় ? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মান্‌লে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে একদিন মুখখান দ্যাখ্‌তি প্যালে না। যে দিন বে করে আনলে মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি, গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আষ্ট ছোট বউ না থাক্‌লি যে দিনি গলায়

দড়ির খবর শুনেলো সেই দিনিই মাঠাকুরুণ মর্‌তো—শুনেলেম সউরে মেয়েগুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া করো্য আখে, আর মা বাপেরি না খাতি দিয়ে মারে, কিন্তু এ বউডোরে দেখে জান্‌লাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরতিমির মধ্যে কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখ্‌তি পাই নে। আ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন—গোডার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়িরিও খাবে ২ কত্তি নেগেচে।—

গোপী। চুপ কর গুওড়া, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার করবে।

গোপ। মুই কী কর্‌বো, তুমি তো খুঁচয়ে ২ বিষ বাইর কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটিতি বসি গোডার শালারে গালাগালি করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা করো্য মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যঙ্গের সর্দ্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো?

গোপী। গুয়োডা নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ।—

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে, সাহেবেরা কামার আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোডার কুটিতে দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওডা বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আস্‌বার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা করো্য মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব।—

প্রস্থান

গোপী। বোধ করি ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুন্‌বে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে তাতেও মন উঠিল না; পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমির কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিক থাক্‌তে হয়।

উডের প্রবেশ

উড। এ কথা যেন কেহ না জানতে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাকবে। এখানকার জন্যে দশ জন পোদ সুড়্‌কিওয়ালা জোগাড় কর্য়ে রাখ্‌বে—আমি যাবে, ছোট সাহেব যাব, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আন্তে পার্‌বে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষে জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্‌কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্‌বে। শালা আমার কুটির বদনাম কর্য়ে দিয়াছে। হারাম্‌জাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার কর্‌বো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের মাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সুত্র করিয়াছে যদি নবীন

বসের এ বিভ্রাট না হতো তবে এত দিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিয়াছি রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ভয় ভয় করকে হাম্‌কো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কাম্‌মে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কি শালা, তোমারা মোনাসেফ না হোয়্ কাম ছোড় দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাযেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকি মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর আপনি হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাস ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই ?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমক্‌হারাম বেইমান! মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেড্‌লি কমিসন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে ২ পাদ্‌রি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ, মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—অ্যার‍্যাণ্ট কাউয়ার্ড হেলিশ্ নেভ।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা, যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে "গুপে গুওটা গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না!

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই—

একজন উমেদারের প্রবেশ

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি (আপন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা

ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগের সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম্ম কিছু খালি নেই (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ শক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ-সুমিত্রা-নন্দন-নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন-মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে তাহাতে ৩।৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকি পড়ে তাহা বকেয়া বাকি বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়, বকেয়া বাকি ক্রমে ২ উস্মুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে তাহা মহাজনদিগের

আপাততঃ লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন ২ মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন ২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্ম্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমায় ছাড়ন্তো শনি ধরিয়াছে নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদোব হইয়াছিস কেন ? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌চিউয়স্‌ ব্রূট।

গোপী। ধর্ম্মাবতার গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা কুটিতে ডিস্‌পেন্‌সারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুন গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকাদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বস্‌কে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না।

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গোরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বস্‌কে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ঈউ ব্যাসটার্ড অভ্‌ হোরস বিচ্‌। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকাসাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস ডেভিলিষ নিগার! (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম্‌ কাওটকা মাফিক কাম্‌,

ডেগা—শালা কায়েত—কাল্‌কো কাম্‌ দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌সে জেলমে ভেজ দেগা।

উড এবং উমেদারের প্রস্থান

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ২ উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয় নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন কর্যে? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌণপত্নী মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান, ডেওয়ান।

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

গোপীর প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

আদুরী বিছানা করিতে ২ ক্রন্দন

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন কর্যেও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধর্যে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচ্‌তলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে কর্যে যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখ্‌তি পালেন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই

মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেঁড়্যে দেখ্‌তে নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইনি যখন নে পেল্যে গ্যালেন মোরা

ভাবলাম কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাছতলায় আঁচ্‌ড়া পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাকৃতি বাড়ী আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি বাঁচবে? তোমরা এট্টু দাঁড়াও মুই তানাদের ডাকে আনি।

আদুরীর প্রস্থান

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল! বড়বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন আর ও দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "যে কএক দিন এখানে থাকা যায় আমরা কুআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না" বড়বাবু বলিলেন "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে ২ সাহেবকে বলিলেন "হুজুর আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম

ভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।” নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে “যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক যাঁড় কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে” এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, “তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।”

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত দান)

সাধু। অম্‌নি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়্যে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন সুড়কীওয়ালা, বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মাদ্দা হইতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল, বড়সাহেব উঠিয়া জমাদ্দারকে একটা ঘুসি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল, এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ কর্যে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, “তুই এট্টু তফাৎ থাক্ জানি কি ধরা পাকড়া কর্যে নে যাবে” মোর উপর সুমিন্দিদের বড় গোষা, মারামারি হবে জানলি মুই কি লুকয়ে থাকি। এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচয়ে আনতি পাত্তাম, আর দুই সমন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু

মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

“বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাং ॥

বড় বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে। আহা! গোরিব খেটেখেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ম্যাচ করিয়া কাম্‌ড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার গোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি দ্যাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন) বড়বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন, সমিন্দির কাণ দুটো মুই ছিঁড়ে আন্‌তাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি লুক্‌য়ো থাকি, নাত কর্য়ো পেল্‌য়ো যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্‌য়ে দেবে।

নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া প্রস্থান

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েচেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি এক বার ডাকুন দিকি।—

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! (**সজলনয়নে**) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন "মাতঃ যদি অদ্য আপনি আহার না করেন তবে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "বাবা আমি রাজমহিষী ছিলেম রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল? এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের মুখ চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না" বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি

আসিতেছেন।

সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী
এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ

ভয় নাই জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায়—উহুহু!

মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

সৈরি। (রোদন করিতে২) ছোটবউ, তুমি, ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভরো্যে দর্শন করি (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞান সঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক।

প্রস্থান

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়ে এমন আগুন বাহির হতেচে যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

প্রস্থান

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া)(আহা! হা! বৎসহারা হাম্মারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার-পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য্য অস্তগত হইল—আমার বিপিনের উপায় কি হইবে (রোদন করিতে২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ও গো, তোমরা দিদিকে কোলে কর্যে ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা! এই কাল নীলের জন্যই পিতাকে কুটিতে ধর্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্যে তুলে লয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

ভূতলে পতন

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন, মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আলপানায় হস্ত রাখিয়া বল্যেছিলাম, যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, সেজো ঠাকুরুণ! বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী অবিরল অমৃত-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ, দশ দিক্‌ আলোকরা শ্বশুর; শারদকৌমুদীবিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি —আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার

সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গাধামে গমন করিতেছেন (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্ক মুখে একটু গঙ্গাজল দি।

মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না, (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাকৃতো তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরী। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত দাসীকে সঙ্গে হইয়া যাও তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা, আহা, মরি মরি এ কি সর্ব্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস ॥
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্-বান্ধব কর বিপদে বিধান ॥
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমনী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব ॥
কোথা নাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায় ॥

(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)

পরিহরি পরিজন পরমেশ পায়।
লয় গতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃত করিতেছেন (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপ নয়নে কখনও ত দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা, ঠাকুরুণ সরলতাকে এম্নি ভাল বাসেন যে এ অজ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্ট চক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন—দিদি, কেঁদো না, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন কর্‌বেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বল্‌বেন।

গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ
প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে২

সাবি। প্রসব বেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি মুখ দেখে সব দুঃখ গেল (রোদন করিতে২) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিটি লেখে কত্তারে না মার্‌তো, তবে সোণার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন (হাত তালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কত্তার নাম কর্য়ে খোকার মুখে একবার চুমো খাই (নবীনের মুখ চুম্বন)

সৈরি। মা আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখ্‌তে পাচ্চ না—তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়্যে পড়ে রয়েচেন, কথা কহিতে পাচ্যেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুট্‌বে, আহা হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো (ক্রন্দন)।

সৈরি। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন?

সর। দিদি জননীকে বিছানা ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলে, এমন আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না।

চারি দিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক
সরলতার নিকটে গিয়া

তোমার পায়ে পড়ি বিবি ঠাকুরুণ আর একখান চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম। (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলেচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি (হস্ত ছাড়ায়ন)।

সর। মা গো, আমি তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারি নে (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন) মা আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি মরে গিয়েচে, কত্তা আমার সর্গে গিয়েচেন তুই আবাগী নরকে যাবি (হাস্য করিতে২ করতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাইবউ ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই (দৌড়ে নবীনের নিকট উপবেশন)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে বল্যে থাক ছোটবউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোটবউরি না খেব্‌য়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোটবউরি খান্‌কি বল্যে গাল দিলে। হ্যাঁগা মা তুমি মোর কথা শোন্‌চো না—মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আটকৌড়ের দিন আসিস্ তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উট্‌বে তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বল্যেছিলেন, বউমার ছেলে হোলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো, আমি খোকা পেয়েচি ঐ নাম রাখ্‌বো, কত্তা বলতেন কবে খোকা হবে "নবীনমাধব" বল্যে ডাকবো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাক্‌তেন আজ সে সাধ পুর্‌তো।

নেপথ্যে শব্দ

ঐ বাজনা এয়েছে (হাততালি)।

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ উঠে ওঘরে যাও।

কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ

সরলতা রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল বাড়ী রেখে এলে।

আহুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ বড় হালদারেরে বলচেন "মোর কচি ছেলে" আর ছোট হালদার্ণিরি বিবি বল্যে কত গালাগালি দেলেন ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি নেগলো। তোমাদের বলচেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কবি। (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরুণ হস্ত দেন (হাত বাড়াইয়া)।

সাবি। তুই আঁটকুড়ীর ব্যাটা কুটির নোক্ তা নইলে ভাল মান্‌ষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্ কেন, (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব।

প্রস্থান

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তর ভায়ারা অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল; ব্যয় বাহুল্য. কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।—

সাধু। ছোটবাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।—

চার জন জ্ঞাতির প্রবেশ

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কি দুর্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত! রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার২ করিতেছে,

এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু।" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব২ গৃহে যাইতে কহিলাম, যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাত্ততঃ তার্পিণ তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল —কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের একদিকে,
এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর
উপবেশন। যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি, এক দিকে সাধুচরণ, অপর দিকে
রেবতী উপবিষ্ট

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও, মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। বিছানা ঝেড়্যে দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, মা রে মলাম রে বাবার দিগি ফিরয়ে দে।

সাধু। (আস্তে২ ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত। শয্যাকণ্টকি, মরণের পূর্ব্বলক্ষণ (প্রকাশে) জননী আমার, দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনিচি মা, তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা,

তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলেন সেমোনতোনের সমে মোরে সাঁকৃতির মালা দিতি হবে—আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েছে, করবো কি, বাপোরে বাপোঃ। (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোণার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে, দেখ দেখ মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি, ভাল কর্যে চেয়ে দেখ্ না মা।

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আ! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে। (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)

সাধু। কোলে তুলিস্ নে, টাল্ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম, আহা হা! হারাণ যে মোর মউর চড়া কার্ত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন কর্যে, বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! দৌউত্র হয়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো, আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না।

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ্ হু—হু—হু—

রেবতী। নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি! মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা, ই কত্তি নিয়ে এইলে।

সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন

সাধু। চুপ কর, এখন কাঁদিস্ নে, টাল্ যাবে।

রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু কর্য়ে বিছানা কর্য়ে দেলাম তবু মা মোর ছট্‌ফট্ কচ্চেন—আর একটু ভাল অষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা মাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

রাইচরণের প্রস্থান

রেবতী। আহা! অন্নপূন্নো কি চেতন আছেন, তা আপ্‌নি আলোচাল হাতে কর্য়ে মোর ক্ষেত্রমণিরি দেক্‌তি আস্‌বন, মোর কপাল হতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন। আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে,

কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের এক শত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদ্‌রি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি; অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দ্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্বান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া, সম্মুখে পরমা সুন্দরী প্রতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণপূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্‌গতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন "বিন্দুবাবু তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি সেই বেহারায় যাইব তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না"। দুঃশাসন

ডাক্তর হল্যে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুই বার দেখিছি, যেমন দুর্মুখো তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তরবাবুকে সঙ্গে কর্য়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম কর্য়ে ডাক্তরবাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তর হল্যে হাত না ধর্য়ে বল্‌তো বাঁচ্‌বে না, আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ

জল অধিক দিও না। এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপ্‌ড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁদে এখেচে।

কবি। সাধু খল আনয়ন কর আমি ঐষধ বাহির করি।

ঔষধের ডিপা খুলন

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি; রাইচরণ এদিকে আয়।

রেবতী। ও মা মোর কপালে কি হলো! ও মা, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন কর্য়ে, বাপো, বাপো,—ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণি, মা—আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো (ক্রন্দন)।

কবি। চরম কাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ ধর্‌ ধর্‌।

সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পারবো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে, হো. হো, হো।

পাছা চাপড়াইতে ২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান

নবীনমাধবের মৃত শীরর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা

সাবি। আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়—গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে (মুখচুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি ?—গর্‌মি হয় বল্যে কি করবো, আর মশারি না খাট্‌য়ে শোব না। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মর্যে যাই মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এম্‌নি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ কর্যে দেয় না ; গোপালের শোয়াই কেমন কর্যে। আমার কি আর কেউ আছে, কর্ত্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে কর্যে কাঁদিতেছে, হা পোড়াকপালি ! (নবীনের মুখাবলোকন কর্যে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ চুম্বন করিয়া) না বাবা তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি আমি কাঁদিতেছি না (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার মাই খাও—গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম তবু কর্ত্তারে

একবার এনে দিলে না, গোপালের দুদ যোগান করো্যে দিয়ে আবার যেতেন ; বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্‌লিই যমরাজা ছেড়ে দিত (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না—চীৎকার করো্যে কাঁদিতে লাগ্‌লাম তবু আমারে শাকা পর্‌য়্যে দিলে—প্রদীপে পুড়্‌য়ে ফেলিচি তবু আছে (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়্যে গয়না পরা সাজেও না সয়ও না, হাতে ফোস্‌কা হয়েচে (রোদন) আমার শাকাপরা যে ঘুচ্‌য়েচে তার হাতের শাঁকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে (মাটিতে অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপনিই বিছানা করি (মনে ২ শয্যাপাতন) মাজুরটো কাচা হয় নাই (হস্ত বাড়াইয়া) বালিস্‌টে নাগাল পাই নে—কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আস্তে ২ নবীনের মৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্চন্দে শুয়ে থাক, থুথ্‌কুড়ি দিয়ে যাই (বুকে থুথু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো—বাছারে চোক ছাড়া কর্‌বো না আমি গণ্ডি দিয়ে যাই (অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেজেয় দাগ দিতে ২ মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চরোক্ পাক ॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুত্‌রো ফুল ॥
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া ॥
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী ॥

সরলতার প্রবেশ

সর্। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধ করি প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত

ক্লান্তবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃত পুত্রকে কিরূপে আনিলেন। জীবিতনাথ পিতা ভ্রাতা বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মা গো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে২ ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননি, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন করিলে?

মৃত শরীরের নিকট গমন

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদরবিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্, ও সর্ব্বনাশি,

রাঁড়ি আঁট্‌কুড়ির মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, লইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার কর্‌বো।

সর। আহা! আমার শ্বশুর শাশুড়ীর এমন সুবর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্ নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুন্‌য়্যে এয়েচে দেখচি।

কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস্ (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যম-সোহাগিং, এই তোরে মেরে ফেলি। (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান) আমার কত্তারে খেয়েচ, আবার আমার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্ মর্ মর্ মর্ (গলার উপর নৃত্য)।

সর গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা।

সরলতার মৃত্যু

বিন্দুমাধবের প্রবেশ

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছেন—ও মা, ও কি আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। (রোদনান্তর সরলতার মুখচুম্বন)

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে

শোকদুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয় তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা-বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না—আপনার জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা, মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত, শোক-শার্দ্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারি নে—জননি পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলিচি, (সরলতার মৃত শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করে্য আমার বুক ফেটে গেল—হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতল পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম তাহাই ঘটিল! মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়্যে মুখচুম্বন করিবেন না। মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি! (চরণের ধূলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি।

চরণের ধূলি ভক্ষণ

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও

না! সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাক্‌বে—এ কি! এ কি! শাশুড়ী বয়ে এরূপ পড়ে কেন!

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন? কেমন কর্য়ে? কি সর্ব্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ি, তুমি আজো খোঁপায় দেউ নি! আহা! আহা! আর তুমি দিদি বল্যে ডাক্‌বে না (রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করি নি।

আদুরীর প্রবেশ

আদু। বিপিন ডরয়্যে উটেচে, বড় হাল্‌দার্ণি, তুমি শীগ্‌গির এস!

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারিস্ নি, একা রেখে এইচিস্।

আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুবনক্ষেত্র! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীন দূর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নবদূর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা: আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়্‌দর্শন, অচিরাৎ শোভা সহ কূল ভগ্ন

হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর!

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ পারাবার॥
শোকশূলে মাথা হলো বিষ বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার॥
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলতা মম লুকালো কোথায়॥
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না॥

সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ সঙ্গীত॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো করো ছিল মম দেহ সরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার॥

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকং।

তথ্য-নির্দেশ

দীনবন্ধু মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে দীনবন্ধুর জন্ম 'সন ১২৩৮' বলে উল্লেখ করলেও ললিতচন্দ্র মিত্রের মতানুসারে তাঁর পিতার জন্ম '১২৩৬ চৈত্র।'
দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ এগার এবং ডঃ মিহিরকুমার দাশ, পৃঃ ১১ ;

২। দীনবন্ধু রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ) পৃঃ ৩৭১

৩। 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে 'নীলদর্পন' নাটকের অনুবাদক হিসেবে জেম্‌স লঙ্ সাহেবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, ললিতচন্দ্র মিত্র (History of the Indigo Disturbance in Bengal with a full report of the Nil Durpan Case, Calcutta 1903) ও নগেন্দ্রনাথ সোম (মধুস্মৃতি, কলিকাতা ১৯২০) 'নীলদর্পন' নাটকের অনুবাদক হিসেবে মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখ করেছেন। এতথ্যই বর্তমানে স্বীকৃত। কিন্তু আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর এক প্রবন্ধে (নীলদর্পনের ইংরেজী অনুবাদ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত) এই স্বীকৃত তথ্যের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন।
দ্রষ্টব্য ঃ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা (সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত) মাঘ—চৈত্র ১৩৭১।

৪। নগেন্দ্রনাথ বসু (সংকলিত), বিশ্বকোষ—অষ্টম খণ্ড (কলিকাতা ১৮৯৭), পৃঃ ৫৮৫।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-দীনবন্ধু মিত্র (কলিকাতা, ১৯৭০), পৃঃ ১৩৭-৪০।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯।

৭। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৩৭১), পৃঃ ৮২৫—২৭।

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪১।

৯। বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২৭।

১০। ঐ, পৃঃ ৮২৭।

১১। ঐ, পৃঃ ৮২৫।

১২। ডঃ মিহিরকুমার দাশ, দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার (কলিকাতা ১৯৬৮), পৃঃ ১৮

১৩। বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩০।

১৪। ঐ, পৃঃ ৮২৭।

১৫। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—দ্বিতীয় খণ্ড (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), পৃঃ ১৪৫।

দীনবন্ধু মিত্রের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পিমানস

১। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩০ ।

২। 'দীনবন্ধু মিত্র' (কলিকাতা ১৩৭৯), পৃঃ ৬-৭ ।

৩। বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩৭-৪১ ।

৪। ঐ পৃঃ ৮৩০ ।

৫। ঐ পৃ: ৮৩০-৩১ ।

৬। ঐ ৮৩০-৩১ ।

৭। "ইংরেজ শাসন-কালে বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, সে ব্যবস্থার ও তার প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙলার সমাজ প্রায় নতুনরূপে গড়ে উঠ্‌ল। কর্ণওয়ালিসের তৈরী জমিদারী-তন্ত্রে জমির মধ্যস্বত্ব ও বিদেশী শাসকের চাকরি-বাকরি জীবিকার প্রধান অবলম্বনরূপে লাভ করে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকদের, এক নতুন অভ্যুদয় ঘটল।" —গোপাল হালদার, 'ভদ্রলোকের ভিত্তিভূমি'—বাঙালী-সংস্কৃতির রূপ (কলিকাতা ১৯৪৭), পৃঃ ২।

৮। বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩৪ ।

৯। ঐ, পৃঃ ৮৩০ ।

১০। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বঙ্গ সাহিত্যে 'হাস্যরসের ধারা (কলিকাতা ১৯৬০), পৃঃ ৫০৯

১১। ঐ, পৃঃ ২৬৪ ।

১২। ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়, সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—দ্বিতীয় পর্ব (কলিকাতা ১৩৬৮), পৃঃ ২৬৫-৬৬।

১৩। বঙ্কিম রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩১ ।

১৪। ডঃ সুশীলকুমার দে, দীনবন্ধু মিত্র (কলিকাতা ১৩৭৯), পৃং ৭৭।

১৫। "দীনবন্ধু ও বঙ্কিম উভয়েই ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন নামে মাত্র, আসলে আয়ত্ত করেছিলেন গুরুমারা বিদ্যে। ঈশ্বর গুপ্তের পর দীনবন্ধু দামী ও দীপ্যমান ব্যঙ্গরস সৃজনের ক্ষেত্র আনকোরা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাঙালীর রস-চেতনার স্তর ও পরিধি শতগুণে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন।"—মুনীর চৌধুরী।

'মীর-মানস' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮), পৃঃ ৭।

১৬। ডঃ মিহিরকুমার দাশ : দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার (কলিকাতা ১৯৬৮), পৃঃ ৩২।

১৭। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' (কলিকাতা ১৯৭০), পৃঃ ১০৪।

১৮। মোহিতলাল মজুমদার, 'দীনবন্ধু' (প্রবন্ধ)—আধুনিক বাংলা সাহিত্য (কলিকাতা ১৩৬৫), পৃঃ ১১১-১২।

বাংলা নাটকের আদিপর্ব ও দীনবন্ধু মিত্র

১। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ধারা (প্রবন্ধ), দেবকুমার বসু (সম্পাদিত), বাংলা নাটক (১৮৫২-১৯৫৭) গ্রন্থে সঙ্কলিত। (কলিকাতা ১৯৫৭), পৃঃ ২৯।

২। ২রা আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দ (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ)।

৩। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—প্রথমখণ্ড (কলিকাতা ১৩৭৩), পৃঃ ২৪।

৪। দেবকুমার বসু (সম্পাদিত), 'বাংলা নাটক ১৮৫২—১৯৫৭', (কলিকাতা ১৯৫৭) অবলম্বনে নাটকের তালিকা তৈরী করা হয়েছে।

৫। ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা ১৩৬২) থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৯।

৬। 'ভদ্রার্জুন'—শ্রীসুভদ্রকুমার সেন (সম্পাদিত), (কলিকাতা ১৯৬৬), বিজ্ঞাপন, পৃঃ ৩।

৭। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৬।

৮। "I don't know if you have seen 'Sarmistha' or if you have what you think of it. There is another Drama of mine (পদ্মাবতী) which will be soon acted by a company of amateurs. It is also written on the classical model."—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে

এপ্রিল তারিখে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্র। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদন রচনাবলী' (কলিকাতা ১৯৬৭), পৃঃ চুয়ান্ন।

৯। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য (কলিকাতা ১৯৬০), পৃঃ ১২০-২১।

১০। ভূমিকা, দীনবন্ধু রচনা-সংগ্রহ (সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭৩), পৃঃ তেরো-চোদ্দ।

'নীলদর্পণ' নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি

১ (ক) প্রথম বিদ্রোহী সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তারিখে বারাকপুরে রাইফেলের গুলি ছুঁড়েন। বিদ্রোহের এই স্ফুলিঙ্গ ক্রমশ সারা উত্তর ভারতে দাবাগ্নি ছড়িয়ে দেয়।

(খ) নীল-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বড় রকমের হাঙ্গামা প্রথম শুরু হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। বিস্ফোরণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায়।

(গ) 'নীলদর্পণ' নাটক ১৭৮২ শকাব্দের (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ) ২রা আশ্বিন তারিখে ঢাকা থেকে শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক 'বাঙ্গলা যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়।

২। প্রমোদ সেনগুপ্ত, "নীলের ইতিকথা", 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' (কলিকাতা ১৯৬০), পৃঃ ১।

৩। Nemai Sadhan Bose : 'The Indian Awakening and Bengal (Calcutta, 1969), P. 216.

৪। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, 'ঢাকার বিবরণ' (ময়মনসিংহ, ১৯১০), পৃঃ ৯৬।

৫। যতীন্দ্রমোহন রায়, 'ঢাকার ইতিহাস' (কলিকাতা ১৯১২), পৃঃ ১৪০।

৬। যোগেশচন্দ্র বাগল, "নীল বিদ্রোহ", 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা' (কলিকাতা ১৯৪৯) পৃঃ ৫০-৫১।

৭। প্রমোদ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

৮। সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', ২য় খণ্ড (কলিকাতা ১৯২২), পৃঃ ৭৬১।

৯। ডঃ মিহিরকুমার দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪।

১০। Buckland, C. E., Bengal under the Lieutenant Governors, vol. II (Calcutta 1902), P. 242

১১। ডঃ মিহিরকুমার দাস, পৃঃ ১১৪।

১২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১৮১৮-১৮৩০)—প্রথম খণ্ড (কলিকাতা ১৯৪৯), পৃঃ ১০৮।

১৩। "এদেশে জনমত গড়ার উষা লগ্নেই হরিশ মুখার্জীর সাংবাদিক লেখনী ছিল চ্যালেঞ্জে বলিষ্ঠ। নীলকরদের অপকর্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে তিনি কৃষকদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টায় ছিলেন সদাজাগ্রত। ……১৮৫৮-র ২৯ জুলাই-এর পেট্রিয়টে লিখেছিলেন : 'বাঙলাদেশে বর্তমানে নীলচাষ ব্যবস্থা যেভাবে চালু আছে, তা নিঃসন্দেহে শোষণ ও ঠক্‌বাজীনীতি।' হিন্দু পেট্রিয়টের পাতায় নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে বহু সংবাদ ও রচনা প্রকাশিত হয়। সেগুলি একত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হলে, নীলকর অত্যাচারের জলন্ত ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যাবে।"—তারাপদ পাল : ভারতের সংবাদ পত্র : ১৭৮০-১৯৪৭, (কলিকাতা ১৯৭২), পৃঃ ১০১।

১৪। বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১৮৪০-১৯০৫)-দ্বিতীয়খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৬৩), পৃঃ ১২৫-৩২।

১৬। Blair B. Kling : 'The Blue Mutiny (Philadelphia, 1966) PP. 58-59.

১৭। ঐ, P 59.

১৮। "একজন নীলকর সাহেব 'মানুষ' ছিলেন", 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৫ই জুলাই, ১৯৭৩)।

১৯। প্রমোদ সেনগুপ্ত : 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' (কলিকাতা ১৯৬০), পৃঃ ৯০-৯১।

২০। Dr. H.N. Dasgupta, 'The Indian Stage' (Calcutta 1946) P 92.

সাহিত্যে বাস্তবতা ও 'নীলদর্পণ' নাটকে গণ-চেতনার স্বরূপ

১। "যেমনটি তেমনটি" (প্রবন্ধ), 'আর্ট' (কলিকাতা ১৯৬৮), পৃঃ ১৩০।

২। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, 'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা ১৯৬০), পৃঃ ১৪৫।

৩। ডঃ মিহিরকুমার দাশ, 'দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার' (কলিকাতা ১৯৬৮), পৃঃ ১২৮।

৪। প্রমোদ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৯-৪০

৫। Dr, Nemai Sadhan Bose, 'The Indian Awakening and Bengal' (Calcutta 1969) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২১৮।

৬। গোপাল হালদার (সম্পাদিত), 'দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ', ভূমিকা, পৃঃ পনেরো।

৭। মোহিতলাল মজুমদার, "দীনবন্ধু" (প্রবন্ধ), 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১১৮।

সাহিত্যে উদ্দেশ্যমূলকতা ও 'নীলদর্পণ' নাটক

১। অন্নদাশঙ্কর রায়, "লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য" (প্রবন্ধ), 'আর্ট' পৃঃ ১২।

২। দীনবন্ধু রচনাবলী (সাহিত্যসংসদ সংস্করণ), পৃঃ ১।

৩। প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থকারের নামের পরিবর্তে ছিল—"নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমকরণে কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম'।

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (কলিকাতা ১৯৫৭), পৃঃ ২০১-২।

৫। 'দীনবন্ধু মিত্র' (কলিকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ২৯-৩০।

ট্রাজেডির স্বরূপ ও 'নীলদর্পণ' নাটক

১। বিভাস রায় চৌধুরী, 'ট্র্যাজেডি ও বাংলা নাটক' (প্রবন্ধ), 'দেশ' (সাপ্তাহিক), ২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৭।

২। কে, ডি, এফ, কিটো, 'গ্রীক নাটক' (প্রবন্ধ), "সাফোক্লেসের আন্তিগোনে" শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত (সাহিত্য অকাদেমী, নিউদিল্লী ১৯৬৩), পৃঃ ৭-৮

৩। F. L. Lucas, 'Tragedy' (London 1957), P. 24.

৪। Dr. S. C. Sengupta, 'An Introduction to Aristotles' Poetics' (Calcutta 1971), Preface, P. vii

৫। H. J. Muller. 'The Spirit of Tragedy' (Newyork, 1956), P. 327.

৬। ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা' (কলিকাতা ১৯৭৩), পৃঃ ৮।

৭। সৈয়দ আলী আহসান, 'মেঘনাদবধ কাব্যে মানবভাগ্য' (প্রবন্ধ), 'কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা' (চট্টগ্রাম ১৯৬৮), পৃঃ ১২৩।

৮। ঐ, পৃঃ ১২৪।

৯। A. C. Bradley, "Hegels' Theory of Tragedy", 'Oxford Lectures on Poetry' (London 1965), P. 70

১০। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), 'নীলদর্পণ' (কলিকাতা ১৯৬২) ; ভূমিকা, পৃঃ ১॥

১১। (ক) ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' (কলিকাতা ১৯৭০), পৃঃ ১৩৯

(খ) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্যাসাহিত্যের ইতিহাস' —প্রথম খণ্ড (কলিকাতা ১৯৬০), পৃঃ ২৩৭

১২। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২।

১৩। "ট্র্যাজেডি ও তাহার বিবর্তন" (প্রবন্ধ), 'বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ' (কলিকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১১৪।

১৪। ভূমিকা, 'দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ' (ঢাকা ১৯৬৮)॥ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান সম্পাদিত। পৃঃ ২২।

১৫। "Whether a tragedy ends happily or unhappily its principal aim, according to Aristotle, is to arouse pity and fear by drawing dramatic pictures of suffering, and also to effect a catharsis."—Dr. S. C. Sengupta, 'An Introduction to Aristotles' Poetics', P. 63.

১৬। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয়খণ্ড (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), পৃঃ ৮৩৩।

নীলদর্পণ নাটকের নায়ক-সমস্যা

১। ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত: সাহিত্যকোষ : নাটক (কলিকাতা ১৯৬৩), পৃঃ ৯০

২। দীনবন্ধু রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১৯৬৭), পৃঃ ৩।

৩। ঐ, পৃঃ ২২।

৪। ঐ, পৃঃ ৩৫-৩৬।

৫। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ‘নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার’-প্রথম খণ্ড (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৭৩), পৃঃ ৬৬।

চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব

১। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয়খণ্ড (কলিকাতা ১৩৭১), পৃঃ ৮৩১।

২। গোপাল হালদার, ‘বাঙালী সংস্কৃতির রূপ’ (কলিকাতা ১৯৪৭), পৃঃ ২।

৩। ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ‘সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—দ্বিতীয়পর্ব’ (কলিকাতা ১৩৬৮), পৃঃ ২৫৯-৬০।

৪। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৮৩৩।

নাটকে সংলাপের গুরুত্ব ও ‘নীলদর্পণ’ নাটকের সংলাপ বিচার

১। Bernard de Bear Nicol (ed.) Varieties of Dramatic Experience (University of London Press Ltd, 1969) P. 6।

২। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ‘নাটকের কথা’ (কলিকাতা ১৯৬৩), পৃঃ ৩৩।

৩। ডঃ সুশীলকুমার দে, ‘দীনবন্ধু মিত্র’ (কলিকাতা ১৩৭৯), পৃঃ ২৫।

৪। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ৮৩৩।

৫। ঐ, পৃঃ ৮৩৩।

উপসংহার : দীনবন্ধু প্রতিভার স্বকীয়তা ও সীমাবদ্ধতা

১। বঙ্কিম রচনাবলী—দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ৮৩২।

২। ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, “দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশ চিন্তা”, দেশ (সাপ্তাহিক), সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০ (১১ই মে, ১৯৬৩), পৃঃ ২১৫।

(খ) শব্দার্থ টীকা

অক্ত <রক্ত। আঞ্চলিক প্রয়োগ।

অন্তেরা—অন্ত, সন্ধান, তথ্য।

অবধান—মনোনিবেশ। এখানে 'প্রণাম' অর্থে ব্যবহৃত।

অমাবস্থা—আমাশয়।

অরপুরুব—অপরূপ।

আজাদের<রাজাদের। আঞ্চলিক প্রয়োগ।

আদাখ্যাচড়া—অর্ধসম্পূর্ণ। চতুর্থ রাইয়তের বক্তব্য : গত বছরের নীলের দাম তাকে খানিকটা দেয়া হয়েছে।

আসধান—আউশ ধান। 'আ-বৃষ' শব্দ জাত। অর্থাৎ বর্ষাকালে উৎপন্ন ধান।

আষ্ট<রাষ্ট্র অর্থাৎ প্রচারিত। আঞ্চলিক প্রয়োগ।

আঁচড়া-পিচড়ি—আছাড় পিছাড় খাওয়া। এখানে 'মানসিক ব্যাকুলতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অ্যাকন—এখন।

ইক্সুল আইন নির্দিষ্ট ধারা মতে আটক।

এগোনের—আগেকার।

এদিরি—এদের কেই।

এমান—আরবী 'ঈমান' শব্দ জাত। ধর্মবিশ্বাস।

এড়ো—আড়াআড়ি বিস্তৃত।

ককাতি—কাতরোক্তি করিতে।

কনে < কোহানে < কোনখানে — কোথায়। আঞ্চলিক প্রয়োগ।

কস্‌বি—আরবী 'কস্‌ব্‌' (ব্যবসায়) শব্দ জাত। বারাঙ্গনা।

কসম—আরবী 'ক'স্‌ম্‌' শব্দ জাত। শপথ।

কানসারণ— ইংরেজী 'কনসার্ণ' (Concern) শব্দের বিকৃতি।

কামরাঙ্গা—কামরা বা প্রকোষ্ঠ।

কারকিতী—কৃষি কার্যাদি।

কুড়ো—জমির মাপ বিশেষ। বিঘা অর্থাৎ বিশ কাটায় এক কুড়া বা কুড়বা।

কোমেট—ইংরেজী 'কমিটি' (Committee) শব্দের বিকৃতি।

খাপা<খাপ্পা - ফারসী 'খ' 'ফা' শব্দ জাত। অসন্তুষ্ট, রুষ্ট।

খামাত্তে—খামার থেকে।

খোলোসা—আরবী 'খুলাসা' শব্দ জাত। পরিষ্কারভাবে।

গত্তে—করতে।

গল্লা—আরবী 'গ' ল্‌লা' শব্দ জাত। শস্যের আঁটি। এখানে 'গুচ্ছ' অর্থে ব্যবহৃত।

গস্তানি—হিন্দী 'গস্তান' শব্দের অর্থ কুলটা। গালি বিশেষ।

গাদন—জোর করে পেট ভরে খাওয়ানো। অনিচ্ছুক অসমর্থ রাইয়তকে জোর করে নীল বুনতে বাধ্য করার জন্য সাধুচরণ 'নীলের দাদন' না বলে 'নীলের গাদন' বলেছে।

গাঁতা—কৃষকদের চাষের কাজে পারস্পরিক সাহায্য।

গাঁতি—জমিদারের অধীনে জোতজমা।

গারনাল — ইংরেজী 'গভর্ণর' (Governor) শব্দ থেকে।

গোট বেঁদে—দল বেঁধে।

গাঁটি—গাঁটে, ট্যাঁকে

গোডা—গুওটা— গু-খেকোর ব্যাটা। গ্রাম্য গালি বিশেষ।

গৌণপরা —গাউন (Gown) পরিহিতা।

ঘেঁাটা মাত্তি—তোলপাড় করতে।

ঘোল বলাইয়াছে—জব্দ করেছে।

চাবালি—চোয়াল।

চুন্থরি—হিন্দী 'চুন্‌রী' শব্দ জাত। রং করা কাপড়।

চুলগল্লাডা—চুলগোছাটা

ছাবাল—<সংশাবক+আল প্রত্যয় —সন্তান।

ছুট—চুল বাঁধার সরু দড়ি।

জামা—জামাই।

জোরার—যমের।

জোরাবতী—গায়ের জোর।

ঝক্কোতে—ঝট্‌তি, শীঘ্র।

ঝম্‌কে—চম্‌কে

ঝরকা—সংস্কৃত 'জালক' শব্দ জাত। জাল দেয়া জানলা। এখানে 'ঘুলঘুলি'।

ঝাপ্‌টা—স্ত্রীলোকের মাথার গহনা বিশেষ।

ঝার<যাহার।

ঝ্যামন<যেমন।

ঝোজানি<গড়ানি।

টিকিরি—ঠিকা মজুর।

ডব্‌কা—সংস্কৃত 'ডবি' (উড্ডয়ন) শব্দ জাত। সাধারণত উঠতি বয়সের কিশোরীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এখানে উঠতি বয়সের ছেলে'।

ডেড্‌লি কমিসন—নীলকরদের পক্ষে মারাত্মক ইণ্ডিগো কমিসন।

ড্যাক্‌রা—সংস্কৃত 'ডিঙ্গর' শব্দ জাত। ডানপিটে।

তবাদি—পর্যন্ত।

তাইদ্‌গীর—তাগাদা দানকারী।

তাইনে—হারে, প্রত্যেকে

তেতো—তপ্ত

তালিমি সাক্ষী—শেখানো সাক্ষী। আরবী 'তা আ'লীম' শব্দের অর্থ শিক্ষা।

ত্যাকন—তখন অর্থাৎ আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময়।

তেরোনাল—তরবারধারী।

দই<দোহাই।

দাসদিগিতি – দাসদীঘিতে

দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় — নীলকরদের পক্ষসমর্থনকারী ‘ইংলিশম্যান’ ও ‘হরকরা’-সম্পাদকদ্বয়। ‘ইংলিশম্যানে’র সম্পাদক ছিলেন—Walter Brett.

দ্বটি, দ্বটো—দুটি, দুটো

দেয়ালা—সংস্কৃত ‘দেবলীলা’ শব্দ জাত। শিশুরা ঘুমন্ত অবস্থায় কাঁদে ও হাসে। এক ‘দেয়ালা’ বলে।

নচা<রচা।

নচ্‌তি – রচ্‌তে

নট্‌তো—রট্‌তো—রটিত

নমীর আৎ—নবমীর রাত্রি।

নয়দারা রাজিনামা—নয়ধারার সম্মতি পত্র।

নড়ুই<লড়াই।

নাকে<রাখে।

নাজি<রাজি।

নাঙ্গা পাকড়ি — রাঙা পাকড়ি —পুলিস

নাদ না—মোটা লাঠি।

নালায়েক্—ফারসী শব্দ। অযোগ্য, অকেজো।

নাড়, <রাঁড়—বিধবা।

নাতি—রাতি—রাত্রি

নিচু—ছোট, নেহাৎ

নেটেলা<লেঠেল<লাঠিয়াল।

নেয়েত—রাইয়ত, প্রজা।

নোনাফেনা—নোনাজল লেগে নষ্ট চাষের অযোগ্য জমি।

ন্যাকাৎ—মত।

পত্তি—প্রতি।

পত্যই<প্রত্যহই।

পয়মন্ত—শুভ লক্ষণ যুক্ত।

পত্তিবাসী—প্রতিবেশী।

পয়জার—ফারসী ‘পয়যা’র, শব্দজাত। চটিজুতা।

পিল্—আপীল।

পুট্‌ ঠাকুর—পুরুত ঠাকুর।

পেটপোড়া খেব্‌য়েচে — সন্তান-নিরোধ করিবার ঔষধ খাওয়াইয়াছে।

পোঁচা—হাতের তেলো।

ফ্যাবা—চীৎকার।

বট্‌নেকা<বৈঠনেকা—বসবার।

বাউ—বাউটি। অলঙ্কার বিশেষ।

বাউরা—পাগল, খ্যাদা।

বার—সময়

বিদে কাটি—“ক্ষেত্রের তৃণ মারিবার লৌহকণ্টকযুক্ত কাষ্ঠ”

বুনো—বুনো-জাতীয়-কুলি সম্প্রদায়

বিদেকাটি—আগাছা ও ঘাস বেছে ফেলার জন্য লোহা বা কাঠের তৈরী চিরুণীর মত এক ধরণের

চাষের সরঞ্জাম। একে গ্রাম্যভাষায় 'আঁচড়া'ও বলে।

বিদেতা<বিধাতা।

বেওয়াওয়ারি—বিস্তৃতভাবে।

বেগোর—ব্যতীত।

বেনা—সংস্কৃত 'বীরণ' শব্দ জাত। ঘাস বিশেষ।

বেছাপ্পর—আশ্রয়হীন। হিন্দী 'ছাপ্পর' শব্দের অর্থ ছাদ।

বেপালটে—বিপদে

বেল—বেলা

বিটেন টু জেলি — বাংলায় বলা হয়ঃ মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে।

বেহেতার—ফরাসী 'বেহ্‌তর' শব্দ জাত। উত্তম।

ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—রোগের বাড়াবাড়ির কারণ। ব্যাধি+আধিক্য=ব্যাধ্যাধিক্য। সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজের মুখে বেমানান হয় নি।

ব্যাভ্রম —অপমান। 'সম্ভ্রম'-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

ভাবরা<ভাপ্‌রা—উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ। বাষ্প<ভাপ্‌+রা।

ভেমো—কাণ্ডজ্ঞানহীন।

ভোগোল—ওঝা, মন্ত্রব্যবসায়ী।

ভ্যালা — কাপড়ে চিহ্ন দেবার রঙ।

মজুকুর—আরবী 'মজ্‌কুর' শব্দ জাত। পূর্বোল্লিখিত।

মদৎ—আরবী 'মদদ্‌' শব্দ জাত। সাহায্য, সহানুভূতি।

মাইন্দার<মাহিনাদার—মজুর, কৃষকভৃত্য।

মাচেরটক্—ম্যাজিস্ট্রেট।

মাটোব্বর — মাতোব্বর — বিশ্বাস যোগ্য।

মাদ্দা—মোকদ্দমা।

মান্নির<মারাণীর। গালি বিশেষ।

মার্গ—মার্ক—দাগ

মোজা—ফারসী 'মো যা'। সূতার বা পশমের পায়ের আবরণ। তুর্কীরা হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার আবরণ যুক্ত জুতাকে 'মোজা' বলে। এখানে সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মোনাসেফ—মন:পুত।

ম্যাদ—মেয়াদ।

যা—সংস্কৃত 'যাতৃ' শব্দ জাত। পতির ভাতৃজায়া।

যোটা যোট—ষড়যন্ত্র।

রামকান্ত—চর্মনির্মিত চাবুক।

রোকা—আরবী 'রোক্কা' শব্দ জাত। ক্ষুদ্র পত্র।

র‍্যাংরাজ—ইংরাজ

লৌ—সংস্কৃত 'লোহিত' শব্দ জাত। শোণিত, রক্ত।

লাখেরাজ—আরবী 'লা-খি' রাজ' শব্দ জাত। নিষ্কর।

শলভ্—পঙ্গপাল।

শ্যামচাঁদ—নীলকর ব্যবহৃত চাবুকের নাম।

শ্বব্বত্তি—শ্ব-ব্বত্তি। কুকুরের ন্যায় বৃত্তি। ব্রাহ্মণ হয়ে বৃদ্ধ বয়সে অর্থোপার্জনের জন্য চাকুরী করা, পণ্ডিত মশাশেয়র মতে শ্বব্বত্তি।

সফিনা<সপিনা—সমন। আদালতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ।

সমে—সময়ে।

সম্পাদক-যুগল—“দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয়” দ্রষ্টব্য

সলা—আরবী ‘স’লাহ্’ শব্দের অর্থ পরামর্শ। এখানে ‘কূটপরামর্শ’।

সাড়ে সইয়ে—সাড়ে সওয়া, তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ

সাতান<সাতোয়ান—যে নিয়মমত খাজনা দিতে সমর্থ; অবস্থাপন্ন।

সারাক্ষুণ্ডি—সারাক্ষণটি।

সাঁকতি—শাঁক।

সেঁজোতির ব্রত — সন্ধ্যাবাতি > সেঁজুতি বা সেঁজোতি। কুমারী মেয়েরা সন্ধ্যাবাতি জালিয়ে মনের মত পতি কামনা করে এই ব্রত পালন করে থাকে।

সূচিকা ভরণ—কবিরাজী ওষুধ।

সেদের<সাধুর।

সেবের<সাহেবের।

সেমোন্‌তোন < সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভবতী নারীর একটি সংস্কার।

সেঁসয়ে<শাসিয়ে।

সোদা—সোজা, সিধে।

সোমোজকত্তি—সমঝাতে; বুঝতে।

সোয়াল—আরবী ‘সবাল’>সওয়াল >সোয়াল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, জেরা।

হদ্দ—আরবী ‘হ’দ্দ্’। সীমা, অনধিক, বড়জোর।

হাতে ন ক্ষয় যাক—হাতের লৌহ হাতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হউক।

হিরভিতি—কারসাজি।

হিল্লে—উপায়; এখানে ‘আশ্রয়’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হের—এর।

হাংনামা<হাঙ্গামা।

হাল মেরেছে—হালো বলেছে।

(গ) গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ :

অজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস (কলিকাতা, ১৯৭০)।
: বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা (কলিকাতা ১৯৬০)।
: নাটকের কথা (কলিকাতা ১৯৬৩)।

অন্নদাশঙ্কর রায় : আর্ট (কলিকাতা ১৯৬৮)।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : সোফো ক্লেসের 'আন্তি গোনে', সাহিত্য অকাদেমী
(অনূদিত) নিউ দিল্লী, ১৯৬৩।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড
(কলিকাতা, ১৯৬০)।

ঐ (সম্পাদিত) : নীলদর্পণ (কলিকাতা ১৯৬২)

কেদারনাথ মজুমদার : ঢাকার বিবরণ (ময়মনসিংহ ১৯১০)।

ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) : দীনবন্ধু রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা,
১৯৬৭)।

গোপাল হালদার : বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (কলিকাতা ১৯৪৭)

ঐ (সম্পাদিত) : দীনবন্ধু-রচনা-সংগ্রহ (সাক্ষরতা প্রকাশন,
(কলিকাতা ১৯৭৩)।

জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা (কলিকাতা,
১৯৭৩)।

জীবেন্দ্র সিংহরায় : সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—দ্বিতীয় পর্ব
(কলিকাতা, ১৯৬১)।

তারাপদ পাল : ভারতের সংবাদ পত্র (১৭৮০-১৯৪৭), (কলিকাতা
১৯৭২)।

দেবকুমার বসু (সম্পাদিত) : বাংলা নাটক ॥ (১৮৫২-১৯৫৭) (কলিকাতা
১৯৫৭

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ঃ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য (কলিকাতা ১৯৬০)।

প্রমোদ সেনগুপ্ত ঃ নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ (কলিকাতা ১৯৬০)।

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত) ঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজপত্র-দ্বিতীয়খণ্ড (কলিকাতা ১৯৬৩)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাতিহ্য সাধক চরিতমালা—দ্বিতীয়খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, (কলিকাতা)।

ঐ (সংকলিত ও সম্পাদিত) ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথমখণ্ডে (কলিকাতা, ১৯৪৮)।

মিহিরকুমার দাস ঃ দীনবন্ধু মিত্রঃ কবি ও নাট্যকার (কলিকাতা ১৯৬৮)।

মুনীর চৌধুরী ঃ মীর মানস (বাঙ্‌লা একাডেমি, ঢাকা ১৯৬৮)।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত) ঃ দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ (ঢাকা ১৯৬৮)।

মোহিতলাল মজুমদার ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (কলিকাতা ১৯৫৮)।

যতীন্দ্রমোহন রায় ঃ ঢাকার ইতিহাস (কলিকাতা ১৯১২)।

যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ বিদ্রোহ ও বৈরিতা (কলিকাতা ১৯৪৯)।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত ঃ বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ (কলিকাতা ১৯৫৬)।

শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (কলিকাতা ১৯৫৭)।

সতীশচন্দ্র মিত্র ঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয়খণ্ড (কলিকাতা ১৯২২)।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার প্রথমখণ্ড (জাতীয় পরিষদ সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬৬)।

সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৫৫)।

সুভদ্রকুমার সেন (সম্পাদিত) ঃ ভদ্রার্জুন (কলিকাতা ১৯৬৬)।

সুশীলকুমার দে ঃ দীনবন্ধু মিত্র (কলিকাতা ১৯৭২)।

সৈয়দ আলী আহসান ঃ কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (চট্টগ্রাম ১৯৬৮)।

ইংরেজী গ্রন্থ ঃ

Bose, N. S. : The Indian Awakening and Bengal (Calcutta, 1969)

Bradley, A. C : Oxford Lectures on Poetry (London 1965)

Buckland, C, E : Bengal Under the Lieutenant Governors Vol II (Calcutta 1902).

Dasgupta, H. N : The Indian Stage (Calcutta 1946)

Kling, Blair B. : The Blue Mutiny (Philadelphia, 1966).

Lucas, F. L. : Tragedy (London 1957).

Muller, H. J. : The Spirit of Tragedy (Newyork 1956).

Nicol B. B. (ed.) : Varieties of Dramatic Experience (University of London Press Ltd. 1969).

Sengupta, S. C. : An Introduction to Aristotle's Poeties (Calcutta 1971),

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ঃ

আনন্দ রায় ঃ একজন নীলকর সাহেব মানুষ ছিলেন, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৫ই জুলাই, ১৯৭৩।

পুলকেশ দে সরকার ঃ ব্রিটিশ রাজকোষে সাহিত্য ও প্রকাশক, গ্রন্থজগৎ (মাসিক), আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭২।

বিভাস রায়চৌধুরী ঃ 'ট্র্যাজেডি ও বাংলা নাটক' দেশ (সাপ্তাহিক), ২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৭।

রণজিৎ গুহ : Neel-Darpan : A Liberal's view of a Peasant Rovolt, 'Frontier' (Weekly), 29th Dec., 1972.

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ঃ দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশ চিন্তা, দেশ (সাপ্তাহিক) ১১ই মে ১৯৬৩।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও নীলদর্পণ নাটক, পূর্বাচল (মাসিক), পৌষ ১৩৮০।

সুনীল সেন ঃ দীনবন্ধু ও নীলদর্পণ প্রসঙ্গে, বিচিন্তা (মাসিক), চৈত্র ১৩৭৯।

কোষগ্রন্থ ও অভিধান ঃ

অলোক রায় (সম্পাদিত) ঃ সাহিত্যকোষ ঃ নাটক (প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬৩)।

কাজী আবদুল ওদুদ (সম্পাদিত) ঃ ব্যবহারিক শব্দকোষ (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬০)।

নগেন্দ্রনাথ বসু (সংকলিত) বিশ্বকোষ—অষ্টম খণ্ড (কলিকাতা ১৮৯৭)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত) ঃ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (৩খণ্ড) (বাঙলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৬৫ ও ১৯৬৮)।

রাজশেখর বসু (সংকলিত) ঃ চলন্তিকা (একাদশ সংস্করণ, (কলিকাতা ১৯৭৩)।

John Russell taylor : The Peuguin Dictionary of the Theatre (First Ed. Middlesex, 1966).
